IslamHouse.com

সংক্ষিপ্ত হজ, উমরা ও যিয়ারত

আলী হাসান তৈয়ব

সংক্ষিপ্ত হজ্জ উমরা ও যিয়ারত:

গ্রন্থটিতে হজ উমরা ও যিয়ারত সংক্রান্ত কাজসমূহের দলীলভিত্তিক আলোচনার স্থান পেয়েছে। এটি মূলত কয়েকজন গবেষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত রূপ, যাদের অন্যতম ছিলেন, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া -গবেষক ও

সম্পাদক হিসেবে এবং নুমান আবুল বাশার ও আলী হাসান তৈয়ব -তারা এ গবেষণা কর্মটির পিছনে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, বাংলা ভাষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং এ সংক্রান্ত সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ।

https://islamhouse.com/৩৭৩৫০০

- সংক্ষিপ্ত হজ, উমরা ও যিয়ারত
- নু‘মান আবুল বাশার
    - ভূমিকা

  - হজের সফর : সফরের দো‘আ
    - হজ-উমরার বিধি-নিষেধ জানা অবশ্য কর্তব্য কেন?
  - হজ-উমরার সংজ্ঞা
  - হজ ও উমরার ফযীলত
- « أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً »
  - হজের প্রকারভেদ
    - ইহরামের সুন্নাতসমূহ
  - উমরা
    - প্রথম. ইহরাম
    - দ্বিতীয়. মক্কায় প্রবেশ
    - তৃতীয়. মসজিদে হারামে প্রবেশ

        - চতুর্থ. বাইতুল্লাহর তাওয়াফ
        - পঞ্চম. সা‘ঈ
        - ষষ্ঠ. মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করা
    - ৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন
    - ৯ যিলহজ: ‘আরাফা দিবস
        - ‘আরাফা দিবসের ফযীলত
    - ‘আরাফায় গমন ও অবস্থান
-
    - মুযদালিফায় রাত যাপন
        - মুযদালিফার পথে রওয়ানা
        - মুযদালিফায় করণীয়
        - মুযদালিফায় উকূফের হুকুম
    - যিলহজের দশম দিবস

        - দশম দিবসের ফজর
        - ১০ যিলহজের অন্যান্য আমল
        - দ্বিতীয় আমল: হাদী তথা পশু যবেহ করা
        - তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা
        - চতুর্থ আমল: তাওয়াফে ইফাযা এবং হজের সা‘ঈ
        - চারটি আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান
    - ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার প্রক্রিয়া
    - «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ».

        - চূড়ান্ত হালাল হয়ে যাওয়া
    - « فَإِذا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حل لَهُ كل شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاء حَتى يَزُورَ البَيتَ»
    - ১০ যিলহজের আরো কিছু আমল
- _
    - আইয়ামুত-তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ
        - আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীকের দিনগুলোতে করণীয়
        - ১১ যিলহজের আমল
        - ১২ যিলহজের আমল
        - মুতা‘আজ্জেল হাজী সাহেবদের করণীয়

IslamHouse.com

- মুতাআখখিরের হাজী সাহেবদের জন্য ১৩ যিলহজের করণীয়
-
  - বিদায়ী তাওয়াফ
-
  - এক নজরে হজ-উমরা
    - হজের রুকন তথা ফরযসমূহ
    - হজের ওয়াজিবসমূহ
    - উমরার রুকন বা ফরযসমূহ
    - উমরার ওয়াজিবসমূহ
    - ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ
-
  - এক নজরে তামাত্তু হজ

- ৮ যিলহজের পূর্বে তামাত্তু হজ পালনকারীর করণীয়
- ৮ যিলহজ
- ৯ যিলহজ (‘আরাফা দিবস)
- ১০ যিলহজ
- ১১ যিলহজ
- ১২ যিলহজ
- ১৩ যিলহজ
- তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী থেকে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়ার বিশেষ দো‘আ
- হজের পরিসমাপ্তি
- মদীনার যিয়ারত

- মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা
- মদীনার ফযীলত
- মসজিদে নববীর ফযীলত
- মসজিদে নববীতে প্রবেশের আদব
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারত
- মদীনায় যেসব জায়গা যিয়ারত করা সুন্নাত
- «إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»

সংক্ষিপ্ত হজ, উমরা ও যিয়ারত

নু‘মান আবুল বাশার

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

সংক্ষিপ্ত হজ্জ উমরা ও যিয়ারত: গ্রন্থটিতে হজ উমরা ও যিয়ারত সংক্রান্ত কাজসমূহের দলীলভিত্তিক আলোচনার স্থান পেয়েছে। এটি মূলত কয়েকজন গবেষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত রূপ, যাদের অন্যতম ছিলেন, ড. আবু বকর

মুহাম্মাদ যাকারিয়া -গবেষক ও সম্পাদক হিসেবে এবং নুমান আবুল বাশার ও আলী হাসান তৈয়ব -তারা এ গবেষণা কর্মটির পিছনে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, বাংলা ভাষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং এ সংক্রান্ত সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার, যিনি আমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ’র হজ ফরয করেছেন। সালাত ও সালাম সৃষ্টির

সেরা সেই মহামানবের ওপর, যাকে তিনি হিদায়াতের দূত হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও অনাগত সকল অনুসারীর ওপর।

হজ বিশ্ব মুসলিমের মিলনমেলা। এ এক বিশাল ও মহতি সমাবেশ। ভাষা, বর্ণ, দেশ ও স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও এখানে দুনিয়ার নানা প্রান্তের মানুষ এক মহৎ ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হয়। এটি একটি আত্মিক, দৈহিক, আর্থিক ও মৌখিক ইবাদত। এতে সামাজিক ও বৈশ্বিক, দাওয়াহ ও প্রচার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ের সমাহার ঘটে।

তাই এর যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তা সঠিকভাবে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। মূলত এসবের মাধ্যমেই হাজী সাহেবান সঠিক অর্থে তাদের হজ পালন করতে পারবেন। পৌঁছতে পারবেন তাদের মূল লক্ষ্যে। কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। আমরা কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকদের ওপর।

বইটির আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে বাংলাদেশ চ্যারিটেবল এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BCRF) -এর গবেষণা পরিষদ ও সম্পাদকমণ্ডলীর একান্ত

নিষ্ঠা ও শ্রমের স্বাক্ষর। এছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের সহযোগিতা আমাদেরকে ঋণী করেছে তারা হলেন, মাওলানা আসাদুজ্জামান, মাওলানা জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, ভাই ওয়ালী উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র কামারুজ্জামান শামীম, মুহাম্মাদ জুনায়েদ, উম্মে হানী ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ বেশ ক'জন মেধাবী মুখ। বিজ্ঞজনদের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণও আমাদেরকে অনেকাংশে ঋণী করেছে।

যার পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিক সহযোগিতায় বইটি প্রকাশের মুখ

দেখতে যাচ্ছে, তিনি হলেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সম্মানিত সদস্য জনাব মিনহাজ মান্নান ইমন। তিনি ও তাঁর বন্ধু জনাব নাঈমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

বাংলাদেশ চ্যারিটেবল এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BCRF)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হজের সফর : সফরের দো‘আ

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের পিঠে আরোহণ করতেন, তখন বলতেন,

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحانَ الذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينْ، وإِنَّا إِلَى ربِّنَا لَمُنْقَلِبُون، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سفَرِنا هَذَا البِرَّ والتَّقْوى، ومِنَ الْعَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هوِّن عَلَيْنا سفَرَنا هَذَا واطْوِعنَّا بُعدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ والأَهْلِ».

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীন; ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না

নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল-বির্‌রা ওয়াত-তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা-তারদা। আল্‌লাহুম্‌মা হাওয়িন ‘আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতবি ‘আন্‌না বু‘দাহু। আল্‌লাহুম্‌মা আনতাস-সাহেবু ফিস-সাফারি, ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি। আল্‌লাহুম্‌মা ইন্‌নী আউযুবিকা মিন ওয়া‘ছাইস সাফারি ওয়া কাআবাতিল মানযারি ওয়া সূইল-মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।)

“আল্‌লাহ মহান। আল্‌লাহ মহান। আল্‌লাহ মহান। পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর

আমরা অবশ্যই ফিরে যাব আমাদের রবের নিকট। হে আল্লাহ, আমাদের এ সফরে আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করি সৎকাজ ও তাকওয়ার এবং এমন আমলের যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এ সফর সহজ করুন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, এ সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনের আপনিই তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও অবাঞ্ছিত দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিজনের মধ্যে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে।”

আর সফর থেকে ফিরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দো‘আগুলো পড়তেন এবং সাথে এ অংশটি যোগ করতেন:

«آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ»

(আয়েবূনা, তায়েবূনা, আবেদূনা, লি রাব্বিনা হামেদূন)।

“আমরা আমাদের রবের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের রবের প্রশংসাকারী।”[১]

হজ-উমরার বিধি-নিষেধ জানা অবশ্য কর্তব্য কেন?

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরয। আর প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জ্ঞান অর্জন করা বিশেষভাবে ফরয। ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান জানা ফরয। কৃষকের জন্য কৃষি সংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় নির্দেশনা জানা ফরয। তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও সালাত কায়েমকারীর জন্য সালাতের যাবতীয় মাসআলা জানা ফরয। হজ পালনকারীর জন্য হজ সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা জানা ফরয।

প্রচুর অর্থ ব্যয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করে হজ থেকে ফেরার পর যদি আলেমের কাছে গিয়ে বলতে হয়, ‘আমি

এই ভুল করেছি, দেখুন তো কোন পথ করা যায় কি-না’, তবে তা দুঃখজনক বটে কি। অথচ তার ওপর ফরয ছিল, হজের সফরের পূর্বেই এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর রচিত সহীহ গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ-শিরোনাম করেছেন এভাবে:

باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]

(এ অধ্যায় ‘কথা ও কাজের আগে জ্ঞান লাভ করার বিষয়ে’। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘সুতরাং তুমি ‘জেনে রাখো’ যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। ইমাম বুখারী রহ. এখানে কথা ও কাজের আগে ইলম তথা

জ্ঞানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ»

“তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ ও উমরার বিধি-বিধান শিখে নাও।”[২] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হজ ও উমরা পালনের আগেই হজ সংক্রান্ত যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, হজ-উমরা পালনকারী প্রত্যেক নর-নারীর জন্য যথাযথভাবে হজ ও উমরার বিষয়াদি জানা ফরয। হজ ও উমরা পালনের বিধি-বিধান জানার পাশাপাশি প্রত্যেক হজ ও উমরাকারীকে অতি গুরুত্বের সাথে হজ ও উমরার শিক্ষণীয় দিকগুলো অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সফরে বা হজের দিনগুলোতে কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, উম্মত ও পরিবার-পরিজন এবং স্বজনদের সাথে উঠাবসায় কী ধরনের আচার-আচরণ করেছেন তা রপ্ত করতে হবে। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টির অধ্যয়ন,

অনুধাবন ও রপ্তকরণ হজ-উমরার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে হজ-উমরার বিধি-বিধান জানা, এর শিক্ষণীয় দিকগুলো অনুধাবন করা এবং সহীহভাবে হজ-উমরা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হজ-উমরার সংজ্ঞা

হজ:

হজের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা।[৩] শরী‘আতের পরিভাষায় হজ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কিছু

জায়গায়, নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু কর্ম সম্পাদন করা।[৪]

উমরা:

উমরার আভিধানিক অর্থ: যিয়ারত করা। শরী'আতের পরিভাষায় উমরা অর্থ, নির্দিষ্ট কিছু কর্ম অর্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সা'ঈ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা।[৫]

হজ ও উমরার ফযীলত

হজ ও উমরার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. হজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন:

«إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, ‘তারপর কী’? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদ করা’। বলা হলো ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘কবুল হজ’।’[৬] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সর্বোত্তম আমল কী-এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন,

«الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا».

“এক আল্লাহর প্রতি ঈমান, অতঃপর মাবরূর হজ, যা সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ; সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মত (অন্যান্য আমলের সাথে তার শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য)।”[৭]

২. পাপমুক্ত হজের প্রতিদান জান্নাত।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.»

“আর মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়”।[৮]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, জিহাদকে তো সর্বোত্তম আমল হিসেবে মনে করা হয়, আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন,

«لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»

“তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে মাবরূর হজ।”[৯] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে ও অভিযানে যাব না’? তিনি বললেন,

«لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

“তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হলো ‘হজ’- মাবরূর হজ।”[১০] আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ».

“বয়োবৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, দুর্বল ও মহিলার জিহাদ হচ্ছে হজ ও উমরা।”[১১]

৪. হজ পাপ মোচন করে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

“যে আল্লাহর জন্য হজ করল, যৌন সম্পর্কযুক্ত অশ্লীল কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃগর্ভ থেকে

ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল।”[১২]

এ হাদীসের অর্থ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ,

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.»

“তুমি কি জান না, ‘কারো ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়, হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয় এবং হজ তার

পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়?”[১৩]

৫. হজের ন্যায় উমরাও পাপ মোচন করে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.»

“যে ব্যক্তি এই ঘরে এলো, অতঃপর যৌন সম্পর্কযুক্ত অশ্লীল কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল, সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত (নিষ্পাপ) হয়ে ফিরে গেল।”

ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতানুসারে এখানে হজকারী ও উমরাকারী উভয় ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।[১৪]

৬. হজ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজকারী ও উমরাকারীর অভাব-অনটনও দূর করে দেয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

“তোমরা হজ ও উমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লাকে।”[১৫]

৭. হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ».

“আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয়ী, হজকারী ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান বা

প্রতিনিধি। আল্লাহ তাদেরকে আহবান করেছেন, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আর তারা তাঁর কাছে চেয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।”[১৬]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ، وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ».

“হজ ও উমরা পালনকারিগণ আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। তারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা

করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।”[১৭]

৮. এক উমরা থেকে আরেক উমরা- মধ্যবর্তী গুনাহ ও পাপের কাফ্ফারা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.»

“এক উমরা থেকে অন্য উমরা- এ দুয়ের মাঝে যা কিছু (পাপ) ঘটবে তা তার জন্য কাফফারা।”[১৮]

৯. হজ করার নিয়তে বের হয়ে মারা গেলেও হজের সাওয়াব পেতে থাকবে। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

“যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, অতপর সে মারা গেছে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হজের নেকী লেখা হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উমরার নেকী লেখা হতে থাকবে।”[১৯]

১০. আল্লাহ তা‘আলা রমযান মাসে উমরা আদায়কে অনেক মর্যাদাশীল

করেছেন। তিনি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করার সমতুল্য সাওয়াবে ভূষিত করেছেন।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.»

“নিশ্চয় রমযানে উমরা করা হজ করার সমতুল্য অথবা তিনি বলেছেন, আমার সাথে হজ করার সমতুল্য।”[২০]

১১. বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হলে প্রতি কদমে নেকী লেখা হয় ও গুনাহ

মাফ করা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً»

“তুমি যখন বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হবে, তোমার বাহনের প্রত্যেকবার মাটিতে পা রাখা এবং পা তোলার বিনিময়ে তোমার জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।”[২১]

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، لا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهِ خَطِيئَةً، وَرَفَعَكَ دَرَجَةً»

“কারণ, যখন তুমি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হবে, তোমার উটনীর প্রত্যেকবার পায়ের ক্ষুর রাখা এবং ক্ষুর তোলার সাথে সাথে তোমার জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে, তোমার একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।”[২২]

স্মরণ রাখা দরকার, যে কেবল আল্লাহকে রাজী করার জন্য আমল করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হজ-উমরা সম্পন্ন করবে, সেই এসব ফযীলত অর্জন করবে। যেকোনো আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত রয়েছে, যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

প্রথম শর্ত: একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»،

“সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তাই পাবে, যা সে নিয়ত করবে।”[২৩]

দ্বিতীয় শর্ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া। কারণ, তিনি বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“যে এমন আমল করল, যাতে আমাদের অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।’[২৪]

অতএব, যার আমল কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হবে তার আমলই

আল্লাহর নিকট কবুল হবে। পক্ষান্তরে যার আমলে উভয় শর্ত অথবা এর যেকোনো একটি অনুপস্থিতি থাকবে, তার আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان: ٢٢]

“আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব।” সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৩]

পক্ষান্তরে যার আমলে উভয় শর্ত পূরণ হবে, তার আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ﴾ [النساء: ١٢٥]

“আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١١٢﴾ [البقرة: ١١٢]

“হ্যাঁ, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, তবে তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১২]

সুতরাং উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, “সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল” হাদীসটি অন্তরের আমলসমূহের মানদণ্ড এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত “যে এমন আমল করল, যাতে আমার অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত” হাদীসটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মানদণ্ড। হাদীস দু’টি

ব্যাপক অর্থবোধক। দীনরে মূল বষিয়াদি ও শাখা-প্রশাখাসমূহ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আমলরে কোনোটহি এর বাইরে নয়। এক কথায় সম্পূর্ণ দীন এর আওতাভুক্ত।

হজরে প্রকারভদে

হজ তনিভাবে আদায় করা যায়: তামাত্তু, করিান ও ইফরাদ।

১. তামাত্তু হজ

তামাত্তু হজরে পরচিয়:

হজরে মাসগুলোতে হজরে সফরে বরে হবার পর প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধা এবং সাথে সাথে এ উমরার পরে

হজের জন্য ইহরাম বাঁধার নিয়তও থাকা।

তামাত্তু হজের নিয়ম:

হাজী সাহেব হজের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু উমরার জন্য তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার মাধ্যমে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবেন এবং স্বাভাবিক কাপড় পরে নিবেন। তারপর যিলহজ মাসের আট তারিখ মিনা যাবার আগে নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজের ইহরাম বাঁধবেন।

তামাত্তু হজ তিনভাবে আদায় করা যায়

ক) মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ-সা‘ঈ করে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং হজ পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করা। ৮ যিলহজ হজের ইহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

খ) মীকাত থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমন করা। উমরার কার্যক্রম তথা তাওয়াফ, সা‘ঈ করার পর হলক-কসর সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। হজের পূর্বেই যিয়ারতে মদীনা সেরে নেওয়া এবং মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে যুল-হুলাইফা বা আবইয়ারে আলী থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসা। অতঃপর

উমরা আদায় করে হলক-কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া, তারপর ৮ যিলহজ হজের জন্য নতুনভাবে ইহরাম বেঁধে হজ আদায় করা।

গ) ইহরাম না বেঁধে সরাসরি মদীনা গমন করা। যিয়ারতে মদীনা শেষে করে মক্কায় আসার পথে যুল-হুলাইফা বা আবইয়ারে আলী থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা অতপর মক্কায় এসে তাওয়াফ, সা‘ঈ ও হলক-কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর ৮ যিলহজ হজের ইহরাম বাঁধা।

২. কিরান হজ

কিরান হজের পরিচয়:

উমরার সাথে যুক্ত করে একই সফরে ও একই ইহরামে উমরা ও হজ আদায় করাকে কিরান হজ বলে।

কিরান হজের নিয়ম: কিরান হজ দু’ভাবে আদায় করা যায়।

ক) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় একই সাথে হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাববাইকা উমরাতান ওয়া হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। তারপর মক্কায় পেঁছে প্রথমে উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। অতঃপর হজের সময় ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনা-‘আরাফা-মুযদালিফায়

গমন এবং হজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

খ) মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজের নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেওয়া। উমরার তাওয়াফ-সা‘ঈ শেষে করে ইহরাম অবস্থায় হজের অপেক্ষায় থাকা এবং ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৩. ইফরাদ হজ

ইফরাদ হজের পরিচয়:

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে ইফরাদ হজ বলে।

ইফরাদ হজের নিয়ম:

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বাঁধার জন্য لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদূম অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফ এবং হজের জন্য সা‘ঈ করা। অতঃপর ১০ যিলহজ কুরবানীর দিন হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। এরপর হজের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করা।

তাওয়াফে কুদূমের পর হজের সা‘ঈকে তাওয়াফে ইফাযা অর্থাৎ ফরয তাওয়াফের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয আছে।

ইহরামের সুন্নাতসমূহ

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো সুন্নাত:

১. নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগল ও নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ»

‘পাঁচটি জিনিস ফিতরাতের অংশ: খাতনা করা, ক্ষৌরকার্য করা, বগলের চুল উপড়ানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।’ ফকিহবিদগণ বলছেন, এই আমলগুলো ইবাদতের মনোরম পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা ও বগলের চুল উপড়ানোর সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ

করে দিয়েছেন। আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি এসব কাজ ফেলে না রাখি।”[২৫]

মাথার চুল ছোট না করে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম ইহরামের পূর্বে মাথার চুল কেটেছেন বা মাথা মুণ্ডন করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, ইহরামের আগে বা পরে কখনো দাড়ি কামানো যাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

“তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচারণ করো। দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো।”[২৬]

২. গোসল করা। যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ».

“তিনি দেখেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পাল্টিয়েছেন এবং গোসল করেছেন।”[২৭]

এই গোসল পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য, এমনকি নিফাস ও হায়েযবতীর জন্যও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিন্‌ত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যুল-হুলায়ফায় সন্তান প্রসবের পর বলেন,

«اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى».

“তুমি গোসল কর, কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধ এবং ইহরাম বাঁধো।”[২৮]

গোসল করা সম্ভব না হলে অযু করা। অযু-গোসল কোনোটাই যদি করার সুযোগ না থাকে তাহলেও কোন সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হবে

না। কেননা গোসলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও দুর্গন্ধমুক্ত হওয়া। তায়াম্মুম দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে এসেছে,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ».

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরাম বাঁধার

পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে মিশকযুক্ত সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।”[২৯]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি তাঁর মাথা ও দাড়িতে অবশিষ্ট থাকত যেমনটি অনুমিত হয় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি থেকে। তিনি বলেন,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ».

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর কাছে থাকা উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধির চকচকে

ভাব দেখতে পেতাম।” তিনি আরো বলেন,

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ».

“আমি যেন মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিঁথিতে মিশকযুক্ত সুগন্ধির চকচকে ভাব লক্ষ্য করছি।”[৩০]

লক্ষণীয়, ইহরাম বাঁধার পর শরীরের কোনো অংশে সুগন্ধির প্রভাব রয়ে গেলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা কোনোভাবেই জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমকে সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান পরিহার করতে বলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘ইহরাম অবস্থায় কাপড় পরতে আমাদের কী করণীয়? উত্তরে তিনি বলেন, ‘তোমরা জাফরান এবং ওয়ারস (এক প্রকার সুগন্ধি) লাগানো কাপড় পরিধান করো না।’[৩১]

৪. সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি ও সাদা চাদর পরা এবং এক জোড়া জুতো বা স্যান্ডেল পায়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ».

“তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি লুঙ্গি, একটি চাদর এবং এক জোড়া চপ্পল পরিধান করে ইহরাম বাঁধে।”[৩২]

সাদা কাপড় পুরুষের সর্বোত্তম পোশাক। তাই পুরুষের ইহরামের জন্য সাদা কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। ইহরামের ক্ষেত্রে মহিলার আলাদা কোন পোশাক নেই। শালীন ও ঢিলে-ঢালা, পর্দা বজায় থাকে এ ধরনের যেকোনো পোশাক পরে মহিলা ইহরাম বাঁধতে পারে। ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়।[৩৩]

তবে ইহরাম অবস্থায় নিকাব বা অনুরূপ কোন পোশাক দিয়ে সর্বক্ষণ চেহারা ঢেকে রাখা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে, ‘মহিলা যেন নেকাব না লাগায় ও হাতমোজা না পরে।’[৩৪] তবে এর অর্থ এ নয় যে, বেগানা পুরুষের সামনেও মহিলা তার চেহারা খোলা রাখবে। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মাথার ওপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে মহিলাগণ বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করবে।[৩৫]

৫. সালাতের পর ইহরাম বাঁধা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর ইহরাম বেঁধেছেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করে উটের পিঠে আরোহণ করলেন এবং তাওহীদের বাণী:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক) বলে ইহরাম বাঁধলেন।’[৩৬]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফাতে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর উটটি যখন তাঁকে নিয়ে যুল-হুলাইফার মসজিদের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়াল,

তখন তিনি সেই কালেমাগুলো উচ্চারণ করে ইহরাম বাঁধলেন।’[৩৭]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আকীক উপত্যকায় বলতে শুনেছি,

«أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».

“আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক রাতের বেলায় আমার কাছে এসে বলল, এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, একটি হজের মধ্যে একটি উমরা।”[৩৮]

এসব হাদীসের আলোকে একদল আলিম বলেন, ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাকাত ইহরামের সালাত আদায় করা সুন্নাত। আরেকদল ‘আলিমের মতে ইহরামের জন্য কোনো বিশেষ সালাত নেই। তারা বলেছেন, ইহরাম বাঁধার সময় যদি ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে হজ ও উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত আদায়ের পর ইহরাম বাঁধা উত্তম। অন্যথায় সালাত ছাড়াই ইহরাম বাঁধবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাতের পর ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর তাঁর সালাতে এমন কোনো লক্ষণ ছিল না, যা ইহরামের বিশেষ সালাতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে, ইহরামের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সালাত নেই। তাই ইহরাম বাঁধার সময় যদি ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে ফরয সালাত আদায়ের পর ইহরাম বাঁধবে। অন্যথায় সম্ভব হলে তাহিয়্যাতুল অযু হিসেবে দুই রাকাত সালাত পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।[৩৯]

৬. তালবিয়ার শব্দগুলো বেশি বেশি উচ্চারণ করা। কেননা তালবিয়া হজের শ্লোগান। তালবিয়া যত বেশি পাঠ করা যাবে, তত বেশি সাওয়াব অর্জিত হবে।

উমরা

বাংলাদেশি হাজীদের অধিকাংশই তামাত্তু হজ করে থাকেন। আর তামাত্তু হজের প্রথম কাজ উমরা আদায় করা। তাই নিম্নে উমরা আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

উমরার পরিচয়:

ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো এবং মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা- এই ইবাদত সমষ্টির নাম উমরা। এসবের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম. ইহরাম

যেভাবে ফরয গোসল করা হয় মীকাতে পৌঁছার পর সেভাবে গোসল করা সুন্নাত। যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে যেমন উল্লেখ হয়েছে:

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ».

“তিনি দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্য আলাদা হলেন এবং গোসল করলেন।”[৪০]

ইহরাম-পূর্ব এই গোসল পুরুষ-মহিলা সবার জন্য এমনকি হায়েয ও নিফাসবতী মহিলার জন্যও সুন্নাত।

কারণ, বিদায় হজ্জের সময় যখন আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর জন্ম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে বলেন,

«اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى».

“তুমি গোসল করো, কাপড় দিয়ে রক্ত আটকাও এবং ইহরাম বেঁধে নাও।”[৪১]

অতঃপর নিজের কাছে থাকা সর্বোত্তম সুগন্ধি মাথা ও দাড়িতে ব্যবহার করবেন। ইহরামের পর এর সুবাস অবশিষ্ট থাকলেও তাতে কোন সমস্যা নেই। আয়েশা সিদ্দিকা

রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে যেমনটি জানা যায়, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের প্রস্তুতিকালে তাঁর কাছে থাকা উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। ইহরামের পরও আমি তাঁর চুল ও দাড়িতে এর তেলের উজ্জ্বলতা দেখতে পেতাম।”[৪২]

প্রয়োজন মনে করলে এ সময় বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করবেন; নখ ও গোঁফ কর্তন করবেন। ইহরামের

পর যাতে এসবের প্রয়োজন না হয়- যা তখন নিষিদ্ধ থাকবে। এসব কাজ সরাসরি সুন্নাত নয়। ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এসব করা উচিৎ। ইহরাম বাঁধার অল্পকাল আগে যদি এসব কাজ করে ফেলা হয় তাহলে ইহরাম অবস্থায় আর এসব করতে হবে না। এ থেকে আবার অনেকে ইহরামের আগে মাথার চুল ছোট করাও সুন্নাত মনে করেন। ধারণাটি ভুল। আর এ উপলক্ষে দাড়ি কাটার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, দাড়ি কাটা সব সময়ই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

“তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচারণ করো। দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ ছোট করো।”[৪৩]

গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার- এসব পর্ব সমাপ্ত করার পর ইহরামের পোশাক পরবেন। সম্ভব হলে কোনো সালাতের পর এটি পরিধান করবেন। যদি এসময় কোনো ফরয সালাত থাকে তাহলে তা আদায় করে ইহরাম বাঁধবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। নয়তো দু’রাকাত

'তাহিয়্যাতুল অযু' সালাত পড়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন।

জেনে নেওয়া ভালো, পুরুষদের ইহরামের পোশাক হলো, চাদর ও লুঙ্গি। তবে কাপড় দু'টি সাদা ও পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে মহিলারা ইহরামের পোশাক হিসেবে যা ইচ্ছে তা পরতে পারবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পোশাকটি যেন ছেলেদের পোশাক সদৃশ না হয় এবং তাতে মহিলাদের সৌন্দর্যও প্রস্ফূটিত না হয়। অনুরূপভাবে তারা নেকাব দ্বারা চেহারা আবৃত করবেন না। হাত মোজাও পরবেন না। তবে পর পুরুষের মুখোমুখি হলে চেহারায় কাপড় টেনে দিবেন। ইহরাম

অবস্থায় জুতোও পরতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ».

“তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি লুঙ্গি, একটি চাদর ও একজোড়া জুতো পরে ইহরাম বাঁধে। যদি জুতা না থাকে তাহলে মোজা পরবে। আর মোজা জোড়া একটু কেটে নেবে যেন তা পায়ের গোড়ালীর চেয়ে নিচু হয়।”[44]

উল্লিখিত সবগুলো কাজ শেষে হবার পর অন্তর থেকে উমরা শুরুর নিয়ত করবেন। আর বলবেন, عُمْرَةً لَبَّيْكَ

(‘লাব্বাইকা উমরাতান’) অথবা اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً (‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান’)। উত্তম হলো, বাহনে চড়ার পর ইহরাম বাঁধা ও তালবিয়া পড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত থেকে রওনা হবার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়ে বসেছেন তারপর সেটি নড়ে উঠলে তিনি তালবিয়া পড়া শুরু করেছেন।

আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে সে যদি রোগ বা অন্য কিছুর আশংকা করেন, যা তার উমরার কাজ সম্পাদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে উমরা শুরুর প্রাক্কালে এভাবে নিয়ত করবেন,

«اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

(আল্লাহুম্মা মাহল্লী হাইছু হাবাসতানী।)

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।”[৪৫] অথবা বলবেন,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ওয়া মাহল্লী মিনাল আরদি হায়ছু তাহবিসুনী)

“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আর যেখানে আপনি আমাকে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে

যাব।”[৪৬] কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবা‘আ বিনতে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এমনই শিক্ষা দিয়েছেন।

এসব কাজ সম্পন্ন করার পর অধিকহারে তালবিয়া পড়তে থাকুন। কারণ তালবিয়া হজের শব্দগত নিদর্শন। বিশেষত স্থান, সময় ও অবস্থার পরিবর্তনকালে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বেন। যেমন, উচ্চস্থানে আরোহন বা নিম্নস্থানে অবতরণের সময়, রাত ও দিনের পরিবর্তনের সময় (সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে), কোন অন্যায় বা অনুচিত কাজ হয়ে গেলে এবং সালাত শেষে- ইত্যাদি সময়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়তেন এভাবে:[৪৭]

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ».

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা লাববাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা লাক।) কখনো এর সাথে একটু যোগ করে এভাবেও পড়তেন:[৪৮]

«لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ، لَبَّيْكَ».

(লাব্বাইক ইলাহাল হাক্ক লাব্বাইক)।

ইহরাম পরিধানকারী যদি لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ (লাব্বাইকা যাল মা‘আরিজি) তালবিয়ায় যোগ করেন, তাও উত্তম। বিদায় হজে সাহাবীরা তালবিয়ায় নানা শব্দ সংযোজন করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব শুনেও তাঁদের কিছু বলেন নি।[৪৯]

যদি তালবিয়ায় এভাবে সংযোজন করে:

«لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ».

(লাব্বাইক, লাব্বাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল খাইরু বিইয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার রগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল)। তবে তাতেও কোন অসুবিধে নেই। কারণ

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ধরনের বাক্য সংযোজনের প্রমাণ রয়েছে।[৫০]

পুরুষদের জন্য তালবিয়া উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَتَانِى جِبْرِيلُ - ﷺ - فَأَمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى وَمَنْ مَعِى أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ. بِالإِهْلاَلِ - أَوْ قَالَ – بِالتَّلْبِيَةِ».

“আমার কাছে জিবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। তিনি আমাকে (উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে) নির্দেশ দিলেন এবং এ মর্মে আমার সাহাবী ও সঙ্গীদের নির্দেশ দিতে

বললেন যে, তারা যেন ইহলাল অথবা তিনি বলেছেন তালবিয়া উঁচু গলায় উচ্চারণ করে।”[৫১]

তাছাড়া তালবিয়া জোরে উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনের প্রকাশ ঘটে, একত্ববাদের দীপ্ত ঘোষণা হয় এবং শির্ক থেকে পবিত্রতা প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য সকল আলেমের ঐকমত্যে তালবিয়া, যিকির ও দো‘আ ইত্যাদি শাব্দিক ইবাদতে স্বর উঁচু না করা সুন্নাত। এটাই পর্দা রক্ষা এবং ফিতনা দমনে সহায়ক।

দ্বিতীয়. মক্কায় প্রবেশ

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা স্মরণ করা। মনকে নরম করা। আল্লাহর কাছে পবিত্র মক্কা যে কত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তা স্মরণ করা। পবিত্র মক্কায় থাকা অবস্থায় পবিত্র মক্কার যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা। হজ ও উমরাকারী ব্যক্তির ওপর পবিত্র মক্কায় প্রবেশের পর নিম্নরূপে আমল করা মুস্তাহাব।

১. উপযুক্ত কোনো স্থানে বিশ্রাম নেয়া, যাতে তাওয়াফের পূর্বে সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। শরীরের স্বতস্ফূর্ততা ফিরে আসে। বিশ্রাম

নিতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই।
ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজের সফরে) যী-তুয়ায় এসে রাত যাপন করলেন। সকাল হওয়ার পর তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন।”[৫২] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মক্কায় আসলে যী-তুয়ায় রাত যাপন করতেন। ভোর হলে গোসল করতেন। তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করতেন।[৫৩] বর্তমানে মক্কায়

হাজীদের বাসস্থানে গিয়ে গোসল করে নিলেও এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

২. মুহরিমের জন্য সবদিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশের অবকাশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ».

“মক্কার প্রতিটি অলিগলিই পথ (প্রবেশের স্থান)।”[৫৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহার মুয়াল্লার দিক থেকে, যা বর্তমানে হাজূন নামক উঁচু জায়গায় অবস্থিত ‘কাদা’ নামক পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং নিচু

জায়গা অর্থাৎ ‘কুদাই’ নামক পথ দিয়ে বের হন।[৫৫] সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে কারো পক্ষে মক্কায় প্রবেশ ও প্রস্থান করা সম্ভব হলে তা হবে উত্তম।

কিন্তু বর্তমান-যুগে মোটরযানে করে আপনাকে মক্কায় নেওয়া হবে। আপনার বাসস্থানে যাওয়ার সুবিধামত পথেই আপনাকে যেতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছেন, সেদিন থেকে প্রবেশ করা আপনার জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনার গাড়ি সুবিধামত

যে পথ দিয়ে যাবে, সেপথে দিয়েই আপনি যাবেন। আপনার বাসস্থানে মালপত্র রেখে, বিশ্রাম নিয়ে উমরার প্রস্তুতি নিবেন।

মুহরিম যেকোনো সময় মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। তবে দিনের প্রথম প্রহরে প্রবেশ করা উত্তম। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘যী-তুয়ায় রাতযাপন করেন। সকাল হলে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন।’[৫৬]

তৃতীয়. মসজিদে হারামে প্রবেশ

তালবিয়া পড়তে পড়তে পবিত্র কা‘বার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। যেকোনো দরজা দিয়ে ডান পা দিয়ে, বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহর মাহাত্মের কথা স্মরণ করে এবং হজের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছার তাওফীক দান করায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন। প্রবেশের সময় আল্লাহ যেন তাঁর রহমতের সকল দরজা খুলে দেন সে আকুতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ সম্বলিত নিম্নের দো‘আটি পড়বেন:[৫৭]

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

(আঊযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবী ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।)

“আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে

আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।”

চতুর্থ. বাইতুল্লাহর তাওয়াফ

তাওয়াফের ফযীলত:

তাওয়াফের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে। যেমন,

o আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াফকারীর প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে নেকি লিখবেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আবদুল্লাহ ইবন

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً.»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি নেকি লিখবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।”[৫৮]

o তাওয়াফকারী শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.»

“তুমি যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলে, তখন পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলে যেন আজই তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে।”[৫৯]

o তাওয়াফকারী দাসমুক্ত করার ন্যায় সাওয়াব পায়। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ.»

“যে ব্যক্তি কাবাঘরের সাত চক্কর তাওয়াফ করবে সে একজন দাসমুক্ত করার সাওয়াব পাবে।’[৬০]

০ ফেরেশতার পক্ষ থেকে তাওয়াফকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা আসে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ يَقُولُ اعْمَلْ لِمَا تَسْتَقْبَلُ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى»

“আর যখন তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে বিদা) করবে, তখন তুমি তো নিষ্পাপ। তোমার কাছে একজন ফেরেশতা এসে

তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে হাত রেখে বলবেন, তুমি ভবিষ্যতের জন্য (নেক) আমল কর; তোমার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।’[৬১]

সঠিকভাবে তাওয়াফ করতে নিচের কথাগুলো অনুসরণ করুন

১. সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে অযু করুন তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে কা‘বা শরীফের দিকে এগিয়ে যান।

যদি আপনি তখনই তাওয়াফের ইচ্ছা করেন তাহলে দু’ রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া ছাড়াই তাওয়াফ শুরু করতে যাবেন। কেননা, বাইতুল্লাহর তাওয়াফই

আপনার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যিনি সালাত বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন, তিনি বসার আগেই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নিবেন। যেমন, অন্য মসজিদে প্রবেশের পর পড়তে হয়। এরপর তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে যান। মনে রাখবেন:

- উমরাকারী বা তামাত্তু হজকারীর জন্য এ তাওয়াফটি উমরার তাওয়াফ। কিরান ও ইফরাদ হজকারীর জন্য এটি তাওয়াফে কুদূম বা আগমনী তাওয়াফ।

- মুহরিম ব্যক্তি অন্তরে তাওয়াফের নিয়ত করে তাওয়াফ শুরু করবে। কেননা,

অন্তরই নিয়তের স্থান। উমরাকারী কিংবা তামাত্তুকারী হলে তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে।

তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছার পর সেখানকার আমলগুলো নিম্নরূপে করার চেষ্টা করবেন।

ক. ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করবেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পদ্ধতি হলো, হাজরে আসওয়াদের উপর দু’হাত রাখবেন। ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে আলতোভাবে চুম্বন করবেন। কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস

রাখতে হবে, হাজরে আসওয়াদ উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। লাভ ও ক্ষতি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা চুমো খেয়ে বলেন,

«وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ».

“আমি নিশ্চিত জানি, তুমি কেবল একটি পাথর। তুমি ক্ষতি করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যদি তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম,

তাহলে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।”[৬২]

হাজরে আসওয়াদে চুমো দেওয়ার সময় اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবেন[৬৩] অথবা بِسْمِ اللَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলবেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ রকম বর্ণিত আছে।[৬৪]

খ. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা কষ্টকর হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। নাফে রহ. বলেন, ‘আমি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ

স্পর্শ করলেন তারপর তাতে চুমো দিলেন এবং বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এভাবে করতে দেখার পর থেকে আমি কখনো তা পরিত্যাগ করি নি।’[৬৫]

গ. যদি হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, লাঠি দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং লাঠির যে অংশ দিয়ে স্পর্শ করেছেন সে অংশ চুম্বন করবেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করেন, তিনি বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।’[৬৬]

ঘ. হজের সময়ে বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ করা উভয়টাই অত্যন্ত কঠিন এবং অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। তাই এমতাবস্থায় হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডান হাত উঁচু করে, الله أكبر (আল্লাহু আকবার) বা بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলে ইশারা করবেন। পূর্বে হাজরে আসওয়াদ বরাবর যমীনে একটি খয়েরি রেখা ছিল বর্তমানে তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই হাজরে আসওয়াদ বরাবর মসজিদুল হারামের কার্নিশে থাকা সবুজ বাতি দেখে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসেছেন কি-না তা নির্ণয় করবেন। আর যেহেতু হাত দিয়ে হাজরে

আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয় না তাই হাতে চুম্বনও করবেন না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে বসে তাওয়াফ করলেন। যখন তিনি রুকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের বরাবর হলেন তখন এর দিকে ইশারা করলেন এবং তাকবীর দিলেন।[৬৭] অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন তখন তাঁর হাতের বস্তুটি দিয়ে এর দিকে ইশারা করে তাকবীর দিলেন।[৬৮] তারপর যখনই এর বরাবর হলেন অনুরূপ করলেন। সুতরাং যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে

আসওয়াদের দিকে ইশারা করে তাকবীর দিবেন। হাত চুম্বন করবেন না।

৬. প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি পাথরটিকে চুমো দেওয়া বা হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মানুষকে কষ্ট দিয়ে এ কাজ করতে যাবেন না। এতে খুশূ তথা বিনয়ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এটাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো ঝগড়া-বিবাদ এমনকি মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সহ বেশ কিছু সাহাবী তাওয়াফের শুরুতে বলতেন,[৬৯]

«اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ»

(আল্লহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাছদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফায়াম বি‘আহদিকা ওয়াত- তিবা‘আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন।)

“আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমানের কারণে, আপনার কিতাবে সত্যায়ন, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং আপনার নবী মুহাম্মদের সুন্নতের অনুসরণ করে তাওয়াফ শুরু করছি।”

সুতরাং কেউ যদি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে তাওয়াফের

সূচনায় এই দো‘আটি পড়েন, তবে তাতে দোষ নেই।

২. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করার পর কা‘বা শরীফ হাতের বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের আসল লক্ষ্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই সামনে নিজেকে সমর্পন করা। তাওয়াফের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণে বিনয়-নম্রতা ও হীনতা-দীনতা প্রকাশ পেতো। চেহারায় ফুটে উঠত আত্মসমর্পনের আবহ। পুরুষদের জন্য এই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে ইযতিবা এবং প্রথম তিন চক্করে রমল

করা সুন্নাত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযতিবা করলেন, হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করলেন এবং তাকবীর প্রদান করলেন। আর প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন।”[৭০]

ইযতিবা হলো, গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নিচে রেখে ডান কাঁধ খালি রাখা এবং চাদরের উভয় মাথা বাম কাঁধের উপর রাখা। রমল হলো, ঘনঘন পা ফেলে কাঁধ হেলিয়ে বীর-বিক্রমে

দ্রুত চলা। কা‘বার কাছাকাছি স্থানে রমল করা সম্ভব না হলে দূরে থেকেই রমল করা উচিৎ।

৩. রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের আগের কোণের বরাবর এলে সম্ভব হলে তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন।[৭১] প্রতি চক্করেই এর বরাবর এসে সম্ভব হলে এরকম করবেন।

৪. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী কেন্দ্রিক আমলসমূহ প্রত্যেক চক্করে করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছেন। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন,

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

(রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল-আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা ‘আযাবান নার।)

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।’[৭২] সুতরাং এই দুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে প্রত্যেক চক্করে উক্ত দো‘আটি পড়া সুন্নাত।

তাওয়াফের অবশিষ্ট সময়ে বেশি বেশি করে দো‘আ করবেন। আল্লাহর প্রশংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পড়বেন। কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারেন। মোটকথা, যে ভাষা আপনি ভাল করে বোঝেন, আপনার মনের আকুতি যে ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দো‘আ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ»

“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা‘ঈ ও জামারায় পাথর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিক্র কায়েমের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।”[৭৩] দো‘আ ও যিকির অনুচ্চ স্বরে হওয়া শরী‘আতসম্মত।

৫. কা‘বা ঘরের নিকট দিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। তা সম্ভব না হলে দূর দিয়ে তাওয়াফ করবে। কেননা, মসজিদে হারাম পুরোটাই তাওয়াফের স্থান। সাত চক্কর শেষ হলে, ডান কাঁধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতিপূর্বে খোলা রেখেছিলেন। মনে রাখবেন, শুধু তাওয়াফে কুদূম ও উমরার তাওয়াফেই ইযতিবার বিধান

রয়েছে। অন্য কোনো তাওয়াফে ইযতিবা নেই, রমলও নেই।

৬. সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: ١٢٥]

(ওয়াত্তাখিযূ মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা।)

“মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থল বানাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বাইতুল্লাহর মাঝখানে রাখবেন। হোক না তা দূর থেকে। তারপর সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হলে

দু’ রাকাত সালাত আদায় করবেন। এ সালাতের প্রথম রাকা‘আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ‘কাফিরূন’ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পড়া সুন্নাত।

মাকামে ইবরাহীমে জায়গা না পেলে মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে এমনকি এর বাইরে পড়লেও চলবে। তবুও মানুষকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। পথে-ঘাটে যেখানে- সেখানে সালাত আদায় করা যাবে না। মাকরূহ সময় হলে এ দু’রাকাত সালাত পরে আদায় করে নিন। সালাতের পর হাত উঠিয়ে দো‘আ করার বিধান নেই।

৭. সালাত শেষে করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে ডান হাতে তা স্পর্শ করুন। এটা সুন্নাত। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করবেন না। হজের সময়ে এরকম করা প্রায় অসম্ভব। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»

“অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন। তারপর গেলেন সাফা অভিমুখে।”[৭৪]

৮. এরপর যমযমের কাছে যাওয়া, তার পানি পান করা ও মাথায় ঢালা সুন্নাত। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ»

“তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের কাছে গেলেন। যমযমের পানি পান করলেন এবং তা মাথায় ঢেলে দিলেন”।[৭৫]

পঞ্চম. সা‘ঈ

সঠিকভাবে সা‘ঈর কাজ সম্পন্ন করবেন নিচের নিয়মে

১. সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে বলবেন,

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».

(ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ। আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহী।)

“নিশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন।”[৭৬]

২. এরপর সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন[৭৭] এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে বলবেন,

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيى ويميتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ

شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।)

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান![৭৮] আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই।

প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।”[৭৯]

৩. দো‘আ করার সময় উভয় হাত তুলে দো‘আ করবেন।[৮০]

৪. উল্লেখিত দো‘আটি এবং দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণকর যেকোনো দো‘আ সামর্থ্য অনুযায়ী তিন বার পড়বেন। নিয়ম হলো: উপরের দো‘আটি একবার পড়ে তার সাথে

সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য দো‘আ পড়বেন। তারপর আবার ঐ দো‘আটি পড়ে তার সাথে অন্য দো‘আ পড়বেন। এভাবে তিন বার করবেন।’ কারণ, হাদীসে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে, ‘তারপর তিনি এর মাঝে দো‘আ করেছেন। অনুরূপ তিনবার করেছেন।[৮১] সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাফা-মারওয়ায় পাঠ করার বিবিধ দো‘আ বর্ণিত হয়েছে।[৮২]

৫. সাফা পাহাড়ে দো‘আ শেষে হলে মারওয়ার দিকে যাবেন। যেসব দো‘আ আপনার মনে আসে এবং আপনার কাছে সহজ মনে হয় তা-ই পড়বেন। সাফা থেকে নেমে কিছু দূর এগোলেই উপরে ও

ডানে-বামে সবুজ বাতি জ্বালানো দেখবেন। একে বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার কোল) বলা হয়। এই জায়গাটুকুতে পুরুষ হাজীগণ দৌঁড়ানোর মতো করে দ্রুত গতিতে হেঁটে যাবেন। পরবর্তী সবুজ বাতির আলামত সামনে পড়লে চলার গতি স্বাভাবিক করবেন। তবে মহিলারা এই জায়গাটুকুতেও চলার গতি স্বাভাবিক রাখবেন। সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় নিচের দো‘আটি পড়বেন,

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.»

(রাব্বিগফির্ ওয়ারহাম্, ইন্নাকা আন্তাল আ‘য়ায্যুল আকরাম্।)

“হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।”[৮৩]

৬. এখান থেকে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে উঠবেন। মারওয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে, সাফায় পৌঁছার পূর্বে যে আয়াতটি পড়েছিলেন, তা পড়তে হবে না।

৭. মারওয়ায় উঠার পরে কা‘বাঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণাসহ সাফার মতো এখানেও দো‘আ করবেন।[৮৪]

৮. মারওয়া থেকে নেমে সাফায় আসার পথে সবুজ বাতির কাছে পৌঁছলে সেখান থেকে আবার দ্রুত গতিতে চলবেন। পরবর্তী সবুজ বাতির কাছে পৌঁছলে চলার গতি স্বাভাবিক করবেন।

৯. সাফা পাহাড়ে এসে কা‘বাঘরের দিকে মুখ করে উভয় হাত তুলে আগের মত যিকির ও দো‘আ করবেন। সাফা মারওয়া উভয়টি দো‘আ কবুলের জায়গা। তাই উভয় জায়গাতে বিশেষভাবে দো‘আ করার চেষ্টা করবেন।

১০. একই নিয়মে সা‘ঈর বাকি চক্করগুলোও আদায় করবেন।

সা‘ঈ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

Ø সা‘ঈ করার সময় জামা‘আত দাঁড়িয়ে গেলে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

Ø সা‘ঈ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে আরাম করবেন। এতে সা‘ঈর কোনো ক্ষতি হবে না।

Ø শেষ সা‘ঈ-অর্থাৎ সপ্তম সা‘ঈ-মারওয়াতে গিয়ে শেষ করবেন।

Ø সা‘ঈতে অযু শর্ত নয়। তবে অযু বা পবিত্র অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব।[৮৫]

Ø তাওয়াফ শেষ করার পর যদি কোনো মহিলার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তবে তিনি সা‘ঈ করতে পারবেন।

ষষ্ঠ. মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করা

সা‘ঈ শেষে হওয়ার পর মাথার চুল ছোট বা মুণ্ডন করে নেবেন। বিদায় হজের সময় তামাত্তুকারী সাহাবীগণ চুল ছোট করেছিলেন। হাদীসে এসেছে, «فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا» “অতঃপর সমস্ত মানুষ হালাল হয়ে গেলো এবং তারা চুল ছোট করে নিল।”[৮৬]

সে হিসেবে তামাত্তু হাজীর জন্য উমরার পর মাথার চুল ছোট করা উত্তম। যাতে হজের পর মাথার চুল কামানো যায়। মাথায় যদি একেবারেই চুল না থাকে তাহলে শুধু ক্ষুর চালাবেন। চুল ছোট করা বা মুণ্ডন করার পর গোসল করে স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে

নেবেন। ৮ যিলহজ পর্যন্ত হালাল অবস্থায় থাকবেন।

আর মহিলারা মাথার প্রতিটি চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের কর পরিমাণ কর্তন করবেন; এর চেয়ে বেশি নয়।[৮৭]

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে মুহরিমের উমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি যদি তামাত্তু হজকারী বা স্বতন্ত্র উমরাকারী হন, তবে তার জন্য ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তার সব হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কিরান বা ইফরাদ হজকারী হন, তাহলে এখন তিনি চুল ছোট বা মাথা মুণ্ডন করবেন না। বরং যিলহজের ১০

তারিখে (কুরবানীর দিনে) পাথর মারার পর প্রথম হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবেন।

এ সময়ে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার, সালাত, সাদাকা, তাওয়াফ ইত্যাদি নেক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। বিশেষ করে যিলহজের প্রথম দশদিন, যেগুলোতে নেক কাজ করলে অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব হাসিল হয়।

৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন

হজের মূল কাজ শুরু হয় ৮ যিলহজ থেকে। যিনি হজের নিয়তে এসেছেন তিনি তামাত্তুকারী হলে পূর্বেই উমরা সম্পন্ন করেছেন। এখন তাকে শুধু

হজের কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। তিনি পরবর্তী কাজগুলো নিচের ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন করবেন।

১. ৮ যিলহজ তামাত্তু হজকারী এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে থেকে যারা হজ করতে ইচ্ছুক তারা হজের জন্য ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন করবেন। পক্ষান্তরে যারা মীকাতের বাইরে থেকে ইফরাদ বা কিরান হজের জন্য ইহরাম বেঁধে এসেছেন তারা ইহরামে বহাল থাকা অবস্থায় মিনায় গমন করবেন।

২. নতুন করে ইহরাম বাঁধার আগে ইহরামের সুন্নাত আমলসমূহ যেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করার চেষ্টা

করবেন। যেমনটি পূর্বে মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বাঁধার সময় করেছেন।

৩. অতঃপর নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকেই ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন।

৪. তারপর যদি কোন ফরয সালাতের পর ইহরাম বাঁধা যায় তো ভালো। আর যদি তখন কোনো সালাত না থাকে, তবে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল অযু পড়ে ইহরাম বাঁধা ভালো।

৫. তারপর মনে মনে হজের নিয়ত করে لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হাজ্জান) বলে হজের কাজ শুরু করবেন।

৬. যদি হজ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার আশংকা করেন, তাহলে তালবিয়ার পরপরই বলবেন,

«اللَّهُمَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي»

“আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হাইছু হাবাসতানী”

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যেখানে আটকে দিবেন, সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব।”[৮৮]

৭. যদি বদলী হজ হয় তাহলে মনে মনে তার নিয়্যত করে বদলী হজকারীর পক্ষ থেকে বলবেন,

لَبَّيْكَ حَجًّا عَنْ ....

(লাববাইকা হাজ্জান্ আন....)

(উমুক পুরুষ/মহিলার পক্ষ থেকে লাব্বাইক পাঠ করছি।)[৮৯]

৮. মিনায় গিয়ে যোহর-আসর, মাগরিব-এশা ও পরদিন ফজরের সালাত আদায় করবেন। এ কয়টি সালাত মিনায় আদায় করা সুন্নাত। প্রতিটি সালাতই তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবেন। চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতকে দু'রাকাত করে পড়বেন। জমা করবেন না অর্থাৎ দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করবেন না। কারণ রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় একসাথে দু'ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন নি।

৯. মুস্তাহাব হলো, এ দিন বিশ্রাম নিয়ে হজের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যিক্‌র ও ইস্তেগফার করা এবং বেশি করে তালবিয়া পড়া। সময়-সুযোগ পেলে হজের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন। বিজ্ঞ আলেমগণের ওয়াজ-নসীহত ও হজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনবেন।

১০. ৯ যিলহজ রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাত মিনায় যাপন করেছেন। কোন কারণে রাত্রি যাপন করা সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তা‘আলা

নয়িত অনুযায়ী সাওয়াব দবিনে ইনশাআল্লাহ।

৯ যলিহজ: ‘আরাফা দবিস

‘আরাফা দবিসরে ফযীলত

যলিহজ মাসরে ৯ তারখিকে ‘ইয়াওমু ‘আরাফা’ বা ‘আরাফা দবিস বলা হয়। এই দবিসে ‘আরাফায় অবস্থান করা হজরে শ্রষ্েঠতম আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, ‘হজ হলো ‘আরাফা।’[৯০] সুতরাং ‘আরাফায় অবস্থান করা ফরয। ‘আরাফায় অবস্থান ছাড়া হজ সহীহ হবে না। এ দনিরে ফযীলত ইয়াউমুন-নহর বা কুরবানীর দনিরে কাছাকাছি।

প্রত্যেক হাজী ভাইয়ের উচিৎ, এ দিনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমল করা। এ দিনের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফার দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং বান্দাদের সবচে’ বেশি সংখ্যককে তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ»

“এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফার দিন থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ সেদিন নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, ওরা কী চায়?[৯১]

২. আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ‘আরাফায় অবস্থানকারীদেরে নিয়ে আকাশবাসীদেরে সাথে গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমার বান্দাদেরে দিকে তাকিয়ে দেখে, তারা আমার কাছে এসেছে উস্কোখুস্কো ও ধূলমিলিন অবস্থায়।”[৯২]

৩. ‘আরাফার দিন মুসলিম জাতির জন্য প্রদত্ত আল্লাহর দীন ও নিয়ামত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। তারিক ইবন শিহাব বলেন, ‘ইহূদীরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলল, আপনারা

একটি আয়াত পড়েন থাকেন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে তা নাযিল হবার দিন আমরা উৎসব পালন করতাম। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি অবশ্যই জানি কী উদ্দেশ্যে ও কোথায় তা নাযিল হয়েছে এবং তা নাযিল হবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন। তা ছিল ‘আরাফার দিন। আর আল্লাহর কসম! আমরা ছিলাম ‘আরাফার ময়দানে। (দিনটি জুমা‘আ বার ছিল) (আয়াতটি ছিল

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ [المائدة: ٣]

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩]

৪. জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘আরাফায় অবস্থানকারী ও মুযদালিফায় অবস্থানকারিদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাদের অন্যায়ের জিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পূর্বে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে

চুপ করাতে। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নীরবতা পালন করুন। জনতা নীরব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِيْ مِن رَّبِيْ السَّلاَمُ لأَهْلِ عَرَفَاتَ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ».

“হে লোকসকল, একটু পূর্বে জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার রবের পক্ষ থেকে ‘আরাফায় অবস্থানকারী ও মুযদালিফায় অবস্থানকারীদের জন্য আমার কাছে

সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাদেরে অন্যায়ের যিম্মাদারী নিয়েছেন।”

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রহমত অঢেল ও উত্তম।’[৯৩]

৫. ‘আরাফায় অবস্থানকারিদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে ক্ষমা করে দেন। ইবন উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ:هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَ اللَّهُ عَنْكَ».

“আর ‘আরাফায় তোমার অবস্থান, তখন তো আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতপর ফিরিশতাদের সাথে ‘আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা আমার বান্দা, এরা উস্কোখুস্কো ও ধূলিমলিন হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমার কাছে এসেছে। এরা আমারই রহমতের আশা করে এবং আমার

শাস্তিকে ভয় করে। অথচ এরা আমাকে দেখে না। আর যদি দেখতো তাহলে কেমন হতো? অতঃপর বিশাল মরুভূমির বালুকণা সমান অথবা দুনিয়ার সকল দিবসের সমান অথবা আকাশের বৃষ্টির কণা রাশির সমান পাপও যদি তোমার থাকে, আল্লাহ তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবেন।’[৯৪]

৬. ‘আরাফা দিবসের দো‘আ সর্বোত্তম দো‘আ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ».

“উত্তম দো‘আ হলো ‘আরাফা দিবসের দো‘আ।”[৯৫]

৭. যারা হজ করতে আসে না তারা ‘আরাফার দিন সিয়াম পালন করলে তাদের পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আবূ কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».

“‘আরাফা দিবসের সিয়াম পালন পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়।’[৯৬]

তবে এ সিয়াম হাজীদের জন্য নয়, বরং যারা হজ করতে আসে নি তাদের জন্য। হাজীদের জন্য ‘আরাফার দিবসে সিয়াম পালন সুন্নাত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় ‘আরাফা দিবসে সিয়াম পালন করেন নি; বরং সবার সামনে তিনি দুধ পান করেছেন।’[৯৭] ইকরামা বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়িতে প্রবেশ করে ‘আরাফা দিবসে ‘আরাফার ময়দানে থাকা অবস্থায় সিয়াম পালনের ব্যাপারে

জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরাফার ময়দানে ‘আরাফা দিবসের সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[৯৮] বরং এ দিন হাজী সাহেব সিয়াম পালন না করলে তা বেশি করে দো‘আ, যিকির, ইস্তেগফার ও আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

‘আরাফায় গমন ও অবস্থান

১. সুন্নাত হলো ৯ যিলহজ ভোরে ফজরের সালাত মিনায় আদায় করা।[৯৯] সূর্যোদয়ের পর ‘তালবিয়া’ পড়া অবস্থায় ধীরে সুস্থে ‘আরাফার দিকে রওয়ানা হওয়া। তাকবীর পড়লেও

কোনো অসুবিধা নেই। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.»

‘তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোন দোষ মনে করেননি। আবার তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করতেন। তাতেও তিনি দোষ মনে করেন নি।’[১০০]

২. সুন্নাত হলো সূর্য হেলে পরে মসজিদে নামিরায় যোহর আসর একসাথে হজের ইমামের পিছনে আদায় করে ‘আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সময়ের পূর্বে নামিরায় অবস্থান করেছেন। এতে তাঁর জন্য নির্মিত তাবুতে তিনি যোহর পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়েছেন। নামিরা ‘আরাফার বাইরে। তবে ‘আরাফার সীমানায় অবস্থিত। অতপর সূর্য হেলে পড়লে তিনি যোহর ও আসরের সালাত যোহরের প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে ‘আরাফায় প্রবেশ করেন।’[১০১]

বর্তমান সময়ে এ সুন্নাতের ওপর আমল করা প্রায় অসম্ভব। তবে যদি কারো পথঘাট ভালো করে চেনা থাকে; একা একা ‘আরাফায় সাথিদের কাছে ফিরে আসতে পারবে বলে নিশ্চিত থাকে,

অথবা একা একাই মুযদালিফা গমন, রাত্রিযাপন ও সেখান থেকে মিনার তাঁবুতে ফিরে আসার মতো শক্তি-সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তার পক্ষে নামিরার মসজিদে এ সুন্নাত আদায় করা সম্ভব।

৩. সুন্নাত হলো হজের ইমাম হাজীদের উদ্দেশ্যে সময়োপযোগী খুতবা প্রদান করবেন। তিনি এতে তাওহীদ ও ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবেন। হাজীদেরকে হজের আহকাম সম্পর্কে সচেতন করবেন। তাদেরকে তাওবার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, কুরআন-সুন্নাহর ওপর অটল থাকার আহবান

জানাবেন। যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরাফাতে তাঁর বিদায় হজের খুতবার সময়।

৪. সুন্নাত হলো যোহর আসর কসর করে একসাথে যোহরের সময়ে আদায় করা এবং সুন্নাত বা নফল কোনো সালাত আদায় না করা। এ নিয়ম সব হাজী সাহেবের জন্যই প্রযোজ্য। মক্কাবাসী বা ‘আরাফার আশপাশে বসবাসকারী কিংবা দূরের হাজী সাহেবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যোহর-আসর কসর করে একসাথে যোহরের সময়ে

আদায় করছিলেন। উপস্থিত সকল হাজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কসর করে সে দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করেছেন। তিনি কাউকে পূর্ণ সালাত আদায় করার আদেশ দেননি। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

«يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

“হে মক্কাবাসী, তোমরা (সালাত) পূর্ণ করে নাও। কারণ, আমরা মুসাফির।’ কিন্তু বিদায় হজের সময় তা বলেন নি।

তাই বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ সময়ের সালাতের কসর ও দুই সালাত জমা‘ তথা একত্র করা সুন্নাত। কসর ও জমা‘ না করা অন্যায়। বিদায় হজ সম্পর্কে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَطْنَ الوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপত্যকার মধ্যখানে এলেন। তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। অতঃপর (বিলাল) আযান ও ইকামত দিলেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাতের ইমামত করলেন। পুনরায় (বিলাল) ইকামত

দলিলে এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। এ দু’য়ের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করলেন না।[১০২]

৫. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হজের ইমামের পেছনে জামা‘আত না পেলেও যোহর-আসর একসাথে জমা করতেন, সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে,

«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا».

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইমামের সাথে সালাত না পেলেও দুই সালাত একসাথে পড়তেন।”[১০৩]

প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী নাফে‘ রহ. বলেন, ‘ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ‘আরাফা দিবসে ইমামকে সালাতে না পেলে, নিজ অবস্থানের জায়গাতেই যোহর-আসর একত্রে আদায় করতেন।’[১০৪]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّيتَ يَوْمِ عَرَفَةَ فِيْ رِحْلِكَ فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلاَتَيْنِ لِوَقْتِهَا، وتَرْتَحِلُ مِنْ مُنْزِلٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَأَمَّا فِيْ قَوْلِنَا فَإِنَّهُ يُصَلِّيْهَا فِيْ رِحْلِهِ كَمَا يُصَلِّيْهَا مَعَ الإِمَامِ، يَجْمَعُهُمَا جَمِيْعًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، لأَنَّ الْعَصْرَ إِنَّمَا قُدِّمَتْ لِلْوُقُوْفِ وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ .

“ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. আমাদেরকে হাম্মাদ-ইবরাহীম সূত্রে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আরাফার দিন যদি তুমি নিজের অবস্থানের জায়গায় সালাত আদায় কর তবে দুই সালাতের প্রত্যেকটি যার যার সময়ে আদায় করবে এবং সালাত থেকে

ফারেগ হয়ে নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে প্রস্থান করবে। (ইমাম) মুহাম্মদ রহ. বলেন, (ইমাম) আবূ হানীফা রহ. এ মত গ্রহণ করেন। তবে আমাদের কথা এই যে, (হাজী) তার উভয় সালাত নিজের অবস্থানের জায়গায় ঠিক একইরূপে আদায় করবে যেভাবে আদায় করে ইমামের পেছনে। উভয় সালাতকে এক আযান ও দুই ইকামাতের সাথে একত্রে আদায় করবে। কেননা সালাতুল আসরকে উকুফের স্বার্থে এগিয়ে আনা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুল্লাহ ইবন উমর, আতা ইবন আবী রাবাহ ও মুজাহিদ রহ. থেকে এরূপই আমাদের কাছে পৌঁছেছে।’[১০৫]

তাই হজের ইমামের পেছনে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় সম্ভব হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় যোহর-আসর একত্রে পড়া সুন্নাত।

৬. হাজীগণ সালাত শেষে ‘আরাফার ভেতরে প্রবেশ না করে থাকলে প্রবেশ করবেন। যারা মসজিদে নামিরাতে সালাত আদায় করবেন তারা এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। কেননা মসজিদে নামিরার কিবলার দিকের অংশটি ‘আরাফার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত। মনে রাখবেন, ‘আরাফার বাইরে অবস্থান করলে হজ হবে না।

৭. অতঃপর দো‘আ ও মোনাজাতে লিপ্ত হবেন। দাঁড়িয়ে-বসে-চলমান তথা

সর্বাবস্থায় দো‘আ ও যিকির করতে থাকবেন। সালাত আদায়ের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দু’হাত তুলে অনুচ্চস্বরে বেশি করে দো‘আ, যিকির ও ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকবেন। উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى.»

“আমি ‘আরাফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে উটের পিঠে বসা ছিলাম। তখন তিনি তাঁর দু’হাত তুলে দো‘আ করছিলেন। অতঃপর তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল। এতে তাঁর উষ্ট্রীর

লাগাম পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত দিয়ে লাগামটি তুলে নিলেন এবং তাঁর অন্য হাত উঠানো অবস্থায়ই ছিল।”[১০৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ».

“উত্তম দো‘আ হচ্ছে ‘আরাফার দিনের দো‘আ; আর উত্তম সেই বাক্য যা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছি, তা হচ্ছে, (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু

ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।) ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”[১০৭]

কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসীহতের বৈঠকে শরীক হওয়া ইত্যাদিও ‘আরাফায় অবস্থানের আমলের মধ্যে শামিল হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল বসে বসে নিম্নস্বরে দো‘আ-যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। দিনের শেষ সময়টিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবেন। পুরোপুরিভাবে দো‘আয় মগ্ন থাকবেন।

৮. ‘আরাফার পুরো জায়গাটাই হাজীদের অবস্থানের জায়গা। মনে রাখবেন, উরনা উপত্যকা ‘আরাফার উকূফের স্থানের বাইরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন,

«كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»

“‘আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তবে বাতনে উরনা থেকে তোমরা উঠে যাও।”[১০৮]

বর্তমান মসজিদে নামিরার একাংশ ও এর পার্শ্ববর্তী নিম্ন এলাকাই বাতনে উরনা বা উরনা উপত্যকা। সুতরাং কেউ যেন সেখানে উকূফ না করে। মসজিদে নামিরায় সালাত আদায়ের পর মসজিদের

যে অংশ ‘আরাফার ভেতরে অবস্থিত সে দিকে গিয়ে অবস্থান করুন। বর্তমানে মসজিদের ভেতরেই নীল বাতি দিয়ে ‘আরাফা নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া আছে। অতএব, এ সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

-

[মুযদালিফায় রাত যাপন]

[মুযদালিফার পথে রওয়ানা]

১. যিলহজের ৯ তারিখ সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর হাজী সাহেব ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে ‘আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করবেন। হাজীদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে দূরে থাকবেন। চেঁচামেচি ও খুব দ্রুত হাঁটাচলা

পরিহার করবেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘তিনি ‘আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ‘আরাফা থেকে মুযদালিফা গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে উট হাঁকানোর ধমক ও চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর বেত দিয়ে লোকদেরকে ইশারা করে বললেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ»

“হে লোকসকল! তোমাদের শান্তভাবে চলা উচিৎ। কেননা দ্রুত চলাতে কোনো কল্যাণ নেই।”[১০৯]

২. রাস্তায় জায়গা পাওয়া গেলে দ্রুতগতিতে চালাতে কোনো দোষ নেই। উরওয়া রহ. বলেন, ‘উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে পথ অতিক্রম করছিলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গতিতে পথ অতিক্রম করছিলেন। আর যখন জায়গা পেয়েছেন তখন দ্রুত গতিতে চলছেন।’[১১০]

৩. মাগরিবের সালাত ‘আরাফার ময়দানে কিংবা মুযদালিফার সীমারেখায় প্রবেশের আগে কোথাও আদায় করবেন না।

৪. ‘আরাফার সীমরেখা পার হয়ে প্রায় ৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর মুযদালিফা সীমারেখা শুরু হয়। মুযদালিফার শুরু ও শেষ নির্দেশকারী বোর্ড রয়েছে। বোর্ড দেখেই মুযদালিফায় প্রবেশ করছেন কিনা তা নিশ্চিত হবেন। তাছাড়া বড় বড় লাইটপোস্ট দিয়েও মুযদালিফা চিহ্নিত করা আছে। তা দেখেও নিশ্চিত হতে পারেন।

মুযদালিফায় করণীয়

১. মুযদালিফায় পৌঁছার পর ‘ইশার সময়ে বিলম্ব না করে মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করবেন। মাগরিব ও ইশা উভয়টা এক আযান ও দুই ইকামাতে

আদায় করতে হবে। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় এলেন, সেখানে তিনি মাগরিব ও ইশা এক আযান ও দুই ইকামতসহ আদায় করলেন। এ দুই সালাতের মাঝখানে কোনো তাসবীহ (সুন্নাত বা নফল সালাত) পড়লেন না। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন। ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হওয়া পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকলেন।”[১১১]

আযান দেওয়ার পর ইকামত দিয়ে প্রথমে মাগরিবের তিন রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। এরপর সুন্নাত-নফল না পড়েই ‘ইশার সালাতের ইকামত দিয়ে ‘ইশার দু’রাকাত কসর সালাত আদায় করতে হবে। ফরয সালাত আদায়ের পর বিতরের সালাতও আদায় করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর ও মুকীম কোনো অবস্থায়ই এ সালাত ত্যাগ করতেন না।

২. সালাত আদায়ের পর বিলম্ব না করে বিশ্রাম নেবেন এবং শুয়ে পড়বেন। কেননা ওপরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় সুবহে সাদিক পর্যন্ত শুয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ যিলহজ হাজী সাহেবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে আরাম করার বিধান রেখেছেন। সুতরাং হাজীদের জন্য মুযদালিফার রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী।

৩. মুযদালিফায় পৌঁছার পর যদি ইশার সালাতের সময় না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে,

«إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِى هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

‘এ স্থানে (মুযদালিফায়) এ সালাত দু’টি মাগরিব ও ইশাকে তাদের সময় থেকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।’[১১২]

৪. সুন্নাত হলো সুবহে সাদেক উদিত হলে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো‘আ করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো‘আ ও যিকিরে মশগুল থাকা। আকাশ ফর্সা হবার পর সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে,

«فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

“আকাশ ভালভাবে ফরসা হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকূফ (অবস্থান) করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি (মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে) যাত্রা আরম্ভ করেছেন।”[১১৩]

তাই প্রত্যেক হাজী সাহেবের উচিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মুযদালিফায় রাতযাপন করেছেন, ফজরের পর উকূফ করেছেন, ঠিক সেভাবেই রাতযাপন ও উকূফ করা।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায়ের পর ‘কুযা’ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে

উকূফ করেছেন। বর্তমানে এই পাহাড়ের পাশে মাশ‘আরুল হারাম মসজিদ অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

“আমি এখানে উকূফ করলাম তবে মুযদালিফা পুরোটাই উকূফের স্থান।”[১১৪]

তাই সম্ভব হলে উক্ত মসজিদের কাছে গিয়ে উকূফ করা ভাল। সম্ভব না হলে যেস্থানে রয়েছেন সেটা মুযদালিফার সীমার ভেতরে কি না তা দেখে নিয়ে সেখানেই অবস্থান করুন।

মুযদালিফায় উকূফের হুকুম

১. মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]

“তোমরা যখন ‘আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, মাশ‘আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতোপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮]

২. ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেছেন, ফজর থেকে মূলত মুযদালিফায় উকূফের সময় শুরু হয়। তাঁর মতানুসারে মুযদালিফায় রাত যাপন করা সুন্নাত। আর ফজরের পরে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ ফজরের আগে উযর ছাড়া মুযদালিফা ত্যাগ করে, তার ওপর দম (পশু যবেহ করা) ওয়াজিব হবে। পবিত্র কুরআনের আদেশ এবং মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের দিকে তাকালে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতটি এখানে বিশুদ্ধতম মত হিসেবে প্রতীয়মান হয়।’

৩. দুর্বল ব্যক্তি ও তার দায়িত্বশীল, মহিলা ও তার মাহরাম এবং হজ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির জন্য মধ্যরাতের পর চাঁদ ডুবে গেলে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি রয়েছে। কারণ,

ক. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুর্বল লোকদেরকে দিয়ে রাতেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিলেন।’[১১৫]

খ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পরিবারের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে আগে নিয়ে যেতেন। রাতের বেলায় তারা মুযদালিফায় মাশ‘আরুল

হারামের নিকট উকূফ করতেন। সেখানে তারা যথেচ্ছা আল্লাহর যিকির করতেন। অতপর ইমামের উকূফ ও প্রস্থানের পূর্বেই তারা মুযদালিফা ত্যাগ করতেন। তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় গিয়ে পৌঁছতেন। কেউ পৌঁছতেন তারও পরে। তারা মিনায় পৌঁছে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।’[১১৬]

গ. আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্তদাস আবদুল্লাহ রহ. আসমা

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাত্রি বেলায় মুযদালিফায় অবস্থান করলেন। অতঃপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর বললেন, ‘হে বৎস, চাঁদ কি ডুবে গেছে?’ আমি বললাম, না। অতপর আরো এক ঘন্টা সালাত পড়ার পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বৎস, চাঁদ কি ডুবে গেছে?’ আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, চল। তখন আমরা রওয়ানা হলাম। অতঃপর তিনি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং নিজ আবাসস্থলে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন আমি বললাম, ‘হে অমুক, আমরা তো অনেক প্রত্যুষে বের হয়ে গেছি। তিনি বললেন, হে বৎস, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।’[১১৭]

যিলহজের দশম দিবস

দশম দিবসের ফজর

· আকাশ একেবারে ফর্সা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা করবেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মুযদালিফায় ফজরের সালাত আদায় করে বললেন, ‘মুশরিকরা সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফা ত্যাগ করত না। আর তারা বলতো,

«أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»

“হে ছাবীর তুমি সূর্যের কিরণে আলোকিত হও, যাতে আমরা দ্রুত প্রস্থান করতে পারি, আর তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করত না; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্থান করেছেন।”[১১৮]

· তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করা অবস্থায় মিনার দিকে চলতে থাকবেন। ওয়াদি মুহাস্সারে[১১৯] পৌঁছলে একটু দ্রুত চলবেন। বর্তমানে মানুষ ও

যানবাহনের ভিড়ের কারণে তা কঠিন হয়ে গেছে। তবে সুন্নতের অনুসরণের জন্য মনে মনে নিয়ত করবেন। সুযোগ হলে আমল করার চেষ্টা করবেন।

· বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ আরম্ভ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত

পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।”[১২০]

১০ যিলহজের অন্যান্য আমল

১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

২. হাদী বা পশু যবেহ করা।

৩. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

৪. তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) বা ফরয তাওয়াফ করা।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম আমল: জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ

কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা

সূর্য উদয়ের সময় থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু সুন্নাত হচ্ছে, সূর্য উঠার কিছু সময় পর দিনের আলোতে বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কুরবানীর দিবসের প্রথমভাগে (সূর্য উঠার কিছু পরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করছিলেন।’[১২১] সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ-সুন্নত সময় থাকে। সূর্য হেলে যাওয়া থেকে শুরু

করে ১১ তারিখের সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয। দুর্বল ও যারা দুর্বলের শ্রেণীভুক্ত তাদের জন্য এবং মহিলার জন্য ১০ তারিখের রাতেই সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজর হওয়ার পরে কঙ্কর নিক্ষেপের অবকাশ রয়েছে। মোদ্দাকথা, ১০ যিলহজ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ১১ যিলহজ সুবহে সাদেক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর মারা চলে, এ সময়ের মধ্যে যখন সহজে সুযোগ পাবেন তখনই কঙ্কর মারতে যাবেন।

দুর্বল ও মহিলাদের কঙ্কর নিক্ষেপ

যারা দুর্বল, হাঁটা-চলা করতে পারে না, তারা কঙ্কর মারার জন্য প্রতিনিধি

নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রতিনিধিকে অবশ্যই হজ পালনরত হতে হবে। সে নিজের কঙ্কর প্রথমে মেরে, পরে অন্যের কঙ্কর মারবে।

মহিলা মাত্রই দুর্বল- এ কথা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মাহাতুল মু’মিনীন সকলেই হজ করেছেন। তাঁরা সবাই নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। কেবল সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা মোটা শরীরের অধিকারী হওয়ায় ফজরের আগেই অনুমতি নিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তারপরও তিনি নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। তাই মহিলা হলেই প্রতিনিধি নিয়োগ করা

যাবে, তেমন কোনো কথা নেই। যখন ভিড় কম থাকে, মহিলারা তখন গিয়ে কঙ্কর মারবেন। তারা নিজের কঙ্কর নিজেই মারবেন, এটাই নিয়ম। বর্তমানে জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের ব্যবস্থাপনা খুব চমৎকার। তাতে যেকোন হাজী সহজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। হাঁটা বা চলাফেরা করতে পারে, এরকম ব্যক্তির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই।

কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি

তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় জামরাতের দিকে এগিয়ে যাবেন। মিনার দিক থেকে তৃতীয় ও মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরায় [যাকে জামরাতুল আকাবা বা

জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়] ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কা‘বা ঘর বাঁ দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে দাঁড়াবেন, এভাবে দাঁড়ানো সুন্নাত। অবশ্য অন্য সবদিকে দাঁড়িয়েও নিক্ষেপ করা জায়েয। আল্লাহু আকবার (أَكْبَرُ اللَّهُ) বলে প্রতিটি কঙ্কর ভিন্ন ভিন্নভাবে নিক্ষেপ করবেন। খুশু-খুযূর সাথে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। মনে রাখবেন, কঙ্করগুলো যেন লক্ষ্যস্থল তথা স্তম্ভ বা হাউজের ভেতরে পড়ে। কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলছেন,

﴿وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج: ٣٢]

“আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.»

“বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের বিধান আল্লাহর যিকির কায়েমের উদ্দেশেই করা হয়েছে।”[১২২] তাই

কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ধীরস্থিরতা বজায় রাখা জরুরি, যাতে আল্লাহর নিদর্শনের অসম্মান না হয়। রাগ-আক্রোশ নিয়ে জুতো কিংবা বড় পাথর নিক্ষেপ করা কখনো উচিৎ নয়; বরং এটি মারাত্মক ভুল। জামরাতে শয়তান বাঁধা আছে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন, তা ঠিক নয়। এ ধরনের কথার কোনো ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় আমল: হাদী তথা পশু যবেহ করা

হাদী হলো এক সফরে হজ ও উমরা আদায় করার সুযোগ পাওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের আশায় পশু যবেহ করা।

নিয়ম হলো, বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরে হাদী যবেহ করা। তামাত্তু ও কিরান হজকারী যদি মক্কাবাসী না হয়, তার ওপর হাদী যবেহ করা ওয়াজিব। ইফরাদ হাজীর জন্য হাদী যবেহ করা নফল বা মুস্তাহাব।

হাদী বা কুরবানীর পশু সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা

১. হাদী বা কুরবানীর পশু হতে হবে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। যেমন উট, গরু, ভেড়া, ছাগল।

২. উট ও গরুতে সাতজন অথবা তার চেয়ে কমসংখ্যক হাজী শরীক থাকতে

পারেন। ছাগল ও ভেড়ায় শরীক হওয়ার সুযোগ নেই। হাজী সাহেবদের জন্য একাধিক হাদী যবেহ করা এমনকি একাধিক কুরবানী করার সুযোগ রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে নিজের পক্ষ থেকে একশত উট যবেহ করেছেন।[১২৩]

৩. পশুর বয়স হতে হবে উটের পাঁচ বছর, গরুর দু’বছর, ছাগলের এক বছর। তবে ভেড়ার বয়স ছয় মাস হলেও চলবে।

৪. যবেহ করার সময় নিম্নোক্ত দো‘আ বলতে হবে,

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي»

(বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী।)

“আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে এবং তোমার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ, তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর”।[১২৪]

৫. হাদী বা কুরবানীর পশু যবেহ বা নহর করার সময় গরু ও ছাগলকে বাম পার্শ্বে কিবলামুখী করে যবেহ করা সুন্নাত। আর উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় বাম পা বেঁধে নহর করা সুন্নাত।[১২৫]

৬. উত্তম হলো, হাজী সাহেব নিজের হাদী নিজ হাতে যবেহ করবেন। তবে বর্তমানে তা অনেকাংশেই সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ, যবেহ করার জায়গা অনেক দূরে। তদুপরি সেখানকার রাস্তাঘাট অচেনা। সুতরাং নিজে এ কঠিন কাজটি করতে গিয়ে হজের অন্যান্য ফরয কাজের ব্যাঘাত যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই হাদী যবেহ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যেকোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

৭. ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে হজের আগে সৌদি আরবস্থ সরকার অনুমোদিত

ব্যাংকের মাধ্যমে হাদীর টাকা জমা দিয়ে তাদেরকে উকীল বানাতে পারেন। তারা সরকারী তত্ত্বাবধানে আলেমদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকভাবে আপনার হাদী যবেহ করার কাজটি সম্পন্ন করবেন। এক্ষেত্রে তারতীব বা সে দিনের কাজগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ আপনি উকীল নিযুক্ত করে দায়মুক্ত হয়েছেন। সুতরাং পাথর মারার পর আপনি কোনো প্রকার দেরী বা দ্বিধা না করে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে পারবেন। বিশেষ করে আপনি যদি বয়স্ক হাজী হন, তবে এ পদ্ধতিটিই আপনার জন্য বেশি উপযোগী। কেননা বয়স্ক হাজীদের

হাদীর টাকা যার যার কাছে ফেরত দেওয়া হয়। এ সুযোগে অনেক অসৎ লোক হাজীদের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নানা প্রলোভন দেখায়। এতে করে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

৮. নন-ব্যালটি হাজীগণ বিভিন্ন কাফেলার আওতায় থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রুপ লিডাররা হাদী যবেহ করার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করণীয় হলো, বিশ্বস্ত কয়েকজন তরুণ হাজীকে গ্রুপ লিডারের সাথে দিয়ে দেওয়া, যারা সরেজমিনে হাদী ক্রয় এবং তা যবেহ প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন

এবং অন্যান্য হাজীদেরকে তা অবহিত করবেন।

৯. আর যদি মক্কায় কারো বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন থাকে, তাহলে তাদের মাধ্যমেও হাদী যবেহ করার কাজটি করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যার মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করছেন, তার যথেষ্ট সময় আছে কি না। কেননা হজ মৌসুমে মক্কায় অবস্থানকারীরা নানা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

১০. হাদীস অনুযায়ী হাদী যবেহ করার সময় হচ্ছে চার দিন। কুরবানীর দিন তথা ১০ই যিলহজ এবং তারপর তিন দিন।

১১. উত্তম হলো মিনাতে যবেহ করা। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে যেকোন জায়গায় যবেহ করলে চলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

‘মিনার সব জায়গা কুরবানীর স্থান এবং মক্কার প্রতিটি অলিগলি পথ ও কুরবানীর স্থান।’[১২৬]

১২. কুরবানীদাতার জন্য নিজের হাদীর গোস্ত খাওয়া সুন্নাত। কারণ, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»

“তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু যবেহ করার স্থানে গিয়ে তেষট্টিটি উট নিজ হাতে যবেহ করেন। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যবেহ করতে দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশিষ্টগুলোকে যবেহ করেন এবং তার সাথে নিজের হাদীও যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি উট থেকে একটি অংশ কেটে আনতে আদেশ করলেন। এরপর সবগুলো অংশ একসাথে রান্না

করা হলো। তিনি তার গোশত খেলেন এবং তার ঝোল পান করলেন।”[১২৭]

১৩. হারামের অধিবাসী ও হারামের এরিয়াতে বসবাসকারী মিসকীনদের মধ্যে গোশ্ত বিলিয়ে দেওয়া যাবে। তবে কসাইকে এ গোশ্ত দিয়ে তার কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না। বরং অন্য কিছু দিয়ে তার কাজের পারিশ্রমিক দিতে হবে। কিন্তু কসাই যদি গরীব হয়, তাহলে পারিশ্রমিকের সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে তাকে এ গোশত দেওয়া যাবে।

১৪. তামাত্তু ও কিরান হজকারী যদি হাদী না পায়, কিংবা হাদী ক্রয় করতে সামর্থবান না হয়, তাহলে হজের

দিনগুলোতে তিনটি এবং বাড়িতে ফিরে এসে সাতটি, সর্বমোট দশটি সাওম পালন করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“অতপর যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, সে যে পশু সহজ হবে, (তা যবেহ করবে)। কিন্তু যে তা পাবে না সে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হলো পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মসজিদুল হারামের অধিবাসী

নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

হজের দিনগুলোতে তিনদিন অর্থাৎ হজের সময় কিংবা হজের মাসে। যেমন যিলহজের ৬,৭, ৮ বা ৭, ৮, ৯ অথবা ১১, ১২, ১৩। তবে কুরবানীর দিন সিয়াম পালন করা যাবে না। বাড়িতে ফিরে এসে সাতটি সিয়াম পালন করবে। এ সাতটি সিয়াম পালনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব নয়। অসুস্থতা বা কোনো ওযরের কারণে যদি সিয়াম পালন বিলম্ব হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না।

হাদী ছাড়াও অতিরিক্ত কুরবানী করার বিধান:

বিজ্ঞ আলিমগণ হজের হাদীকে হাদী ও কুরবানী উভয়টার জন্যই যথেষ্ট হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে কুরবানী করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। হাজী যদি মুকীম হয়ে যায় এবং নিসাবের মালিক হয়, তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব বলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে হাজী মুকীম না মুসাফির, এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও বাস্তবে হাজী সাহেবগণ মুকীম নন। তারা তাদের সময়টুকু বিভিন্নস্থানে অতিবাহিত করেন। তাছাড়া দো‘আ কবুল হওয়ার সুবিধার্থে তাদের জন্য মুসাফির অবস্থায় থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

অজানা ভুলের জন্য দম দেওয়ার বিধান

হজকর্ম সম্পাদনের পর কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে কে জানে কোথাও কোনো ভুল হলো কি-না। অনেক গ্রুপ লিডার হাজী সাহেবগণকে উৎসাহিত করেন যে ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই ভুলের মাশুল স্বরূপ একটা দম[১২৮] দিয়ে দিন। নিঃসন্দেহে এরূপ করা শরীয়ত পরিপন্থী। কেননা আপনি ওয়াজিব ভঙ্গ করেছেন তা নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা হওয়া ছাড়া নিজের হজকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি সত্যি সত্যি সন্দেহ হয় তাহলে বিজ্ঞ আলেমগণের কাছে ভাল করে জিজ্ঞেস করবেন। তারা

যদি বলেন যে, আপনার ওপর দম ওয়াজিব হয়েছে তাহলে কেবল দম দিয়ে শুধরিয়ে নেবেন। অন্যথায় নয়। শুধু সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে দম দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে নেই। তাই যে যা বলুক না কেন এ ধরনের কথায় মোটেও কর্ণপাত করবেন না।

তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

কঙ্কর নিক্ষেপ ও হাদী যবেহ করার কাজ শেষ হলে, পরবর্তী কাজ হচ্ছে, মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম। পবিত্র কুরআনে মুণ্ডন করার কথা আগে এসেছে, ছোট

করার কথা এসেছে পরে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]

“তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করবে এবং কেউ কেউ চুল ছোট করবে।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৭]

এতে বোঝা গেল, চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা হালাল হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পদ্ধতি

১. মাথা মুণ্ডন করা হোক বা চুল ছোট করা হোক পুরো মাথাব্যাপী করা

সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা মাথাই মুণ্ডন করেছেলিনে। মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা বা ছোট করা, আর কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিরোধী। নাফে‘ রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কাযা‘) قَزَعٌ থেকে বারণ করেছেন। কাযা‘ সম্পর্কে নাফে‘ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, শিশুর মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া।[১২৯]

২. কসর অর্থাৎ চুল ছোট করার অর্থ পুরো মাথা থেকে চুল কেটে ফেলা। ইবন মুনযিরি বলেন, যতটুকু কাটলে চুল ছোট করা বলা হয়, ততটুকু কাটলেই যথেষ্ট হবে।[১৩০]

৩. কারো টাক মাথা থাকলে মাথায় ব্লেড অথবা ক্ষুর চালিয়ে দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

৪. মহিলাদের ক্ষেত্রে হাতের আঙুলের এক কর পরিমাণ চুল কেটে ফেলাই যথেষ্ট। মহিলাদের জন্য হলক নেই। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ».

“মহিলাদের ব্যাপারে মাথা কামানোর বিধান নেই, তাদের ওপর রয়েছে ছোট করার বিধান”।[১৩১]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।”[১৩২]

সুতরাং মহিলাদের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, তারা তাদের মাথার সব চুল একত্রে ধরে অথবা প্রতিটি বেণী থেকে এক আঙুলের প্রথম কর পরিমাণ কাটবে।

৫. মাথা মুণ্ডনের পর শরীরের অন্যান্য অংশের অবিন্যস্ত অবস্থা দূর করা সুন্নাত। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখ কেটেছিলেন।[১৩৩] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হজ অথবা উমরার পর গোঁফ কাটতেন।[১৩৪] অনুরূপভাবে বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করাও বাঞ্ছনীয়। কেননা তা পবিত্র কুরআনের নির্দেশে

﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ﴾ [الحج: ٢٩]

“তারপর তারা যেন তাদের ময়লা পরিষ্কার করে।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৯]-এর আওতায় পড়ে।

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার সুন্নাত পদ্ধতি

মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, মাথার ডান দিকে শুরু করা, এরপর বা দিকে করা। হাদীসে এসেছে,

«قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষৌরকারকে বললেন, নাও। তিনি হাত দিয়ে (মাথার) ডান দিকে ইশারা করলেন, অতঃপর বাম দিকে। এরপর মানুষদেরকে তা দিতে লাগলেন।”[১৩৫]

চতুর্থ আমল: তাওয়াফে ইফাযা এবং হজের সা‘ঈ

তাওয়াফে ইফাযা ফরয এবং এ তাওয়াফের মাধ্যমেই হজ পূর্ণতা লাভ করে। তওয়াফে ইফাযাকে তাওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। আবার অনেকে এটাকে হজের তাওয়াফও বলে থাকেন। এটি না হলে হজ শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

“তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং

প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৯]

তাওয়াফে ইফাযার নিয়ম

কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদী যবেহ, মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করা এ-তিনটি কাজ শেষ করে গোসল করে, সুগন্ধি মেখে সেলাইযুক্ত কাপড় পরে পবিত্র কাবার দিকে রওয়ানা হবেন। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে স্বাভাবিক পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ الْبَيْتَ.»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের জন্য, আর হালাল হওয়ার জন্য তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।”[১৩৬]

শুরুতে উমরা আদায়ের সময় যে নিয়মে তাওয়াফ করছেন ঠিক সে নিয়মে তাওয়াফ করবেন। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন, তবে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা নেই।

তাওয়াফ শেষ করার পর দু’রাকাত সালাত আদায় করে নিবেন। সেটা যদি মাকামে ইবরাহীমের সামনে সম্ভব না হয়, তাহলে যেকোন স্থানে আদায় করে নিতে পারেন। সালাত শেষে যমযমের

পানি পান করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন।[১৩৭]

তাওয়াফের পর, পূর্বে উমরার সময় যেভাবে সা‘ঈ করেছেন ঠিক সেভাবে সাফা মারওয়ার সা‘ঈ করবেন।[১৩৮]

ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে ইফাযা

ঋতুবতী মহিলা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্য সব বিধান যেমন ‘আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও দো‘আ-যিকির ইত্যাদি সবই করতে পারবে। কিন্তু স্রাব বন্ধ না হওয়া

পর্যন্ত তাওয়াফ করতে পারবে না। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নিবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো দম দিতে হবে না। আর যদি ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণে তাওয়াফে ইফাযার জন্য অপেক্ষা করতে না পারে এবং পরবর্তীতে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নেওয়ারও কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে সে গোসল করে ন্যাপকিন বা এ জাতীয় কিছুর সাহায্য নিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করে তাওয়াফ করে ফেলবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের আদেশ করেন না।[১৩৯] তাছাড়া মাসিক স্রাব বন্ধ

করার জন্য শারীরিক ক্ষতি না হয় এমন ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

চারটি আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের আমল অনুসারে ১০ যিলহজের ধারাবাহিক আমল হলো, প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতপর হাদীর পশু যবেহ করা, এরপর মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা। এরপর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করা ও সা‘ঈ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এ দিনের এই চারটি আমলের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা তথা আগে-পিছে করা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের পরিপন্থি কাজ। তবে যদি কেউ ওযর বা অপারগতার কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারে, অথবা ভুলবশত আগে-পরে করে বসে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করার সময় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ এরূপ আগে-পিছে করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: لاَ حَرَجَ».

“মিনায় (কুরবানীর দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলছেন, ‘সমস্যা নেই, সমস্যা নেই’। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি।’ তিনি বললেন, ‘কোন সমস্যা নেই।’ এক লোক বলল, ‘আমি সন্ধ্যার পর কঙ্কর মেরেছি।’ তিনি বললেন, ‘সমস্যা নেই”।[১৪০]

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ১০ যিলহজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। তিনি তখন জামরার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল,

«يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ، قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ: افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ»

“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো

সমস্যা নেই। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর সমস্যা নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফে ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর, সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যে প্রশ্নই করা হয়েছে তার উত্তরেই তিনি বলেছেন, কর, সমস্যা নেই।”[১৪১]

এ বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। উযর কিংবা অপারগতার কারণে সেসবের আলোকে আমল করলে ইনশাআল্লাহ হজের কোনো ক্ষতি

হবে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে হাজীদের প্রচণ্ড ভিড় আর হাদী যবেহ প্রক্রিয়াও অনেক জটিল। তাই বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সহজভাবে দেখেছেন আমাদেরও সেভাবে দেখা উচিৎ। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. ১০ যিলহজের কাজসমূহে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারলেও দম ওয়াজিব হবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস্ সানায়েতে লিখা হয়েছে,

فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ إِحْصَارٍ فَعَلَيْهِ لِحَلْقِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

“যদি যবেহে করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে তবে এর জন্য দম দিতে হবে আবূ হানীফা রহ.-এর মতানুযায়ী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ ও একদল শরীয়ত বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী, এর জন্য তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়।”[১৪২]

ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার প্রক্রিয়া

প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া

তামাত্তু ও কিরান হজকারী কঙ্কর নিক্ষেপে, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

ও হাদী যবেহ করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«اذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَل لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ»

“যখন তোমরা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং যবেহ ও হলক করবে, তখন তোমাদের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।”[১৪৩] আর ইফরাদ হজকারী মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে।

প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে মিলন, যৌন আচরণ ছাড়া ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সবকিছু বৈধ

হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ الا النِّسَاءَ».

“স্ত্রীগণ ছাড়া তার জন্য সবকিছু বৈধ হয়ে যাবে।”[১৪৪]

ইমাম আবূ হানীফা রহ. সহ অনেকেই উপরোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম মালেক রহ. বলেন, কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমেই প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি তাঁর মতের পক্ষে দলীল। তিনি বলেন,

«إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ».

“যখন তোমরা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীগণ ছাড়া সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।”[১৪৫]

শাফেঈদের মতে, কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে।
পক্ষান্তরে হাম্বলীদের মতে, কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ও বায়তুল্লাহর ফরয- তাওয়াফ এই তিনটি আমলের মধ্যে থেকে যেকোন দুটি করার মাধ্যমে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে।

চূড়ান্ত হালাল হয়ে যাওয়া

কঙ্কর নিক্ষেপ, পশু যবেহ, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা, বায়তুল্লাহর ফরয তাওয়াফ ও সা‘ঈ- এসব আমল সম্পন্ন করলে হাজী সাহেব পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর সাথে যৌন-মিলনও তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حل لَهُ كل شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءِ حَتَى يَزُورَ البَيتَ»

“আর যখন সে (হাজী) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। তবে বায়তুল্লাহর যিয়ারত না করা পর্যন্ত স্ত্রীগণ হালাল হবে না।”[১৪৬]

এ থেকে বোঝা যায়, চূড়ান্ত হালাল তখনই হবে, যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ বা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করবে।

১০ যিলহজের আরো কিছু আমল

১. যিকির ও তাকবীর

১০ যিলহজ কুরবানীর দিন। এ দিনটি মূলত আইয়ামে তাশরীকের অন্তর্ভুক্ত। আইয়ামে তাশরীক হলো, যিলহজের ১০, ১১, ১২ এবং (যিনি বিলম্ব করছেন তার জন্য) ১৩ তারিখ। তাশরীকের এই দিনগুলোতে হাজী সাহেবদের করণীয় হলো, বেশি বেশি

আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

“আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে, তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা

হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা উদ্দেশ্য, আইয়ামে তাশরীক।

নুবাইশা আল-হুযালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ... وَذِكْرٍ لِلَّهِ»

“আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার...ও আল্লাহ তা‘আলার যিকিরের দিন।”[১৪৭]

২. ওয়াজ-নসীহত

এদিন হজের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ মানুষদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য খুতবা প্রদান করবেন। আবূ বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন আর এক ব্যক্তি তার লাগাম ধরে ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَىُّ يَوْمٍ هَذا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ»

“এটি কোন দিন? আমরা এই ভেবে চুপ করে রইলাম যে, হয়তো তিনি এদিনের পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি আবার বললেন, এটি কোন মাস? আমরা এভেবে চুপ রইলাম যে, হয়তো তিনি এর পূর্বের নাম ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি যিলহজ মাস নয়?

আমরা বললাম, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্মান তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই শহরের মতোই হারাম তথা পবিত্র ও সম্মানিত। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়। কারণ, উপস্থিত ব্যক্তি হয়তো এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিবে যে তার চেয়ে অধিক হিফাযতকারী হবে।”[১৪৮]

তাছাড়া মানুষকে সঠিক পথের দিশা দান করা এবং শিক্ষা প্রদান করা একটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলেম ও দা‘ঈদের জন্য অপরিহার্য হলো, যথাযথভাবে তাদের এ দায়িত্ব পালন করা।

মিনায় রাত যাপনের বিধান

১. ১০ যিলহজ দিবাগত রাত ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। ১২ যিলহজ যদি মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১২ যিলহজ দিবাগত রাতও মিনায় যাপন করতে হবে। ১৩ যিলহজ কঙ্কর মেরে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে।

২. আর হাজী সাহেবদেরকে যেহেতু তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন করতে হয়। তাই যেসব হাজী সাহেবে

তাওয়াফে ইফাযা ও সা‘ঈ করার জন্য মক্কায় চলে গেছেন, তাদেরকে অবশ্যই তাওয়াফ-সা‘ঈ শেষ করে মিনায় ফিরে আসতে হবে।

৩. মনে রাখা দরকার যে, মিনায় রাত্রিযাপন গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এমনকি সঠিক মতে এটি ওয়াজিব। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত মসজিদুল হারামে আদায় ও তাওয়াফে যিয়ারত শেষ করে মিনায় ফিরে এসেছেন এবং

তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটিয়েছেন।”[১৪৯]

৪. হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি দিয়েছেন এবং উটের দায়িত্বশীলদেরকে মিনার বাইরে রাতযাপনের অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতি প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয়, মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করা ওয়াজিব।

৫. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنًى».

“উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আকাবার ওপারে (মিনার বাইরে) রাত্রিযাপন করা থেকে নিষেধ করতেন এবং তিনি মানুষদেরকে মিনায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিতেন”।[১৫০] মিনায় কেউ রাত্রিযাপন না করলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে শাস্তি দিতেন বলেও এক বর্ণনায় এসেছে।[১৫১]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلاً بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ».

“তোমাদের কেউ যেন আইয়ামে তাশরীকে মিনার কোনো রাত আকাবার ওপারে যাপন না করে।”[১৫২]

এ‘লাউস্সুনান গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

وَدَلاَلَةُ الأَثْرِ عَلَى لُزُوْمِ الْمَبِيْتِ بِمِنَى فِي لَيَالِيْهَا ظَاهِرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْهِدَايَةِ يُشْعِرُ بِوُجُوْبِهَا عِنْدَنَا

“মিনায় রাত্রিযাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে হাদীসের ভাষ্য স্পষ্ট। আর এটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেদায়া[১৫৩]’র প্রকাশ্য বর্ণনা মিনায় রাত্রিযাপন আমাদের মতে ওয়াজিব বলে অভিহিত করে।”[১৫৪]

সুতরাং হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, আইয়ামে তাশরীকে মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহে তাহরীমা।[১৫৫]

মোটকথা বিশুদ্ধ মতে, হাজী সাহেবদের জন্য মিনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব। তাই উক্ত দিনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিনায় অবস্থান করুন। হাজী সাহেবগণ যদি কোন রাতই মিনায় যাপন না করেন, তাহলে আলিমদের মতে, তার ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছু রাত মিনায় থাকেন এবং কিছু রাত অন্যত্র, তাহলে গুনাহগার হবেন। এক্ষেত্রে কিছু সদকা করতে হবে। পারতপক্ষে দিনের বেলায়ও

মিনাতেই থাকুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোও মিনায় কাটিয়েছেন।

৬. বলাবাহুল্য, মিনায় রাত্রিযাপনের অর্থ মিনার এলাকাতে রাত কাটানো। রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু ঘুমিয়ে বা শুয়ে থাকতে হবে। সুতরাং যদি বসে সালাত আদায় করে, দো‘আ যিকির কিংবা কথাবার্তা বলে তাহলেও রাত্রিযাপন হয়ে যাবে। রাতের বেশির ভাগ কিংবা অর্ধরাত অবস্থানের মাধ্যমে রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

এ হুকুম তাদের জন্য যাদের পক্ষে মিনায় অবস্থান করা সহজ এবং যারা

তাঁবু পেয়েছে। পক্ষান্তরে যারা মিনায় তাঁবু পাননি বরং তাদের তাঁবু মুযদালিফার সীমায় পড়ে গেছে, তাদের তাঁবু যদি মিনার তাঁবুর সাথে লাগানো থাকে, তবে তারা তাদের তাঁবুতে অবস্থান করলেই মিনায় রাত্রিযাপন হয়ে যাবে।

-

আইয়ামুত-তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ

আইয়ামুত-তাশরীক বা তাশরীকের দিনগুলোতে করণীয়

এ দিনসমূহ যেমন ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-

ফূর্তি করার দিন। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আইয়ামুত-তাশরীক হলো খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর যিকিরের দিন।' এ দিনসমূহে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেওয়া নিয়ামত নিয়ে আমোদ-ফূর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও যিকির আদায় করা উচিৎ। আর যিকির আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

(১) সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবীর পাঠ করা। আর এ তাকবীর আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিই যে, এ

দিনগুলো আল্লাহর যিকিরের দিন। আর এ যিকিরের নির্দেশ যেমন হাজী সাহেবদের জন্য, তেমনি যারা হজ পালনরত নন তাদের জন্যও।

(২) কুরবানী ও হজের পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ তা‘আলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা।

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা‘আলার যিকির করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছেই তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেওয়া। এমনিভাবে হজ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এবং সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তা‘আলার তাকবীর পাঠ করা।

(৫) এগুলো ছাড়াও যে কোনো সময় এবং যেকোনো অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা।

১১ যিলহজের আমল

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজী সাহেবদের ১০ যিলহজ দিবাগত রাত অর্থাৎ ১১ যিলহজের রাত মিনাতেই যাপন করতে হবে। এটি যেহেতু আইয়ামুত-তাশরীকের রাত তাই সবার উচিৎ এ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা এবং পরদিন ১১ তারিখের আমলের

জন্য প্রস্তুত থাকা। ১১ তারিখের আমলসমূহ নিম্নরূপ:

১. যদি ১০ তারিখের কোন আমল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এ দিনে তা সম্পন্ন করে নিতে চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ ১০ তারিখের আমলের মধ্যে হাদী যবেহ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা অথবা তাওয়াফে ইফাযা বা যিয়ারত সম্পাদন যদি সেদিন কারো পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে তিনি আজ তা সম্পন্ন করতে পারেন।

২. এ দিনের সুনির্দিষ্ট কাজ হলো, কঙ্কর নিক্ষেপ করা। এ দিন তিনটি জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে

হবে। কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন:

গত ১০ তারিখে জামরাতুল ‘আকাবাতে নিক্ষেপ করা কঙ্করগুলোর ন্যায় মিনায় অবস্থিত তাঁবু অথবা রাস্তা কিংবা অন্য যেকোনো স্থান থেকে এ কঙ্করগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আর যারা পূর্বেই কঙ্কর সংগ্রহ করে এনেছেন তাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

৩. প্রত্যেক জামরাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। সবগুলোর সমষ্টি দাঁড়াবে একুশটি কঙ্কর। তবে আরো দু’চারটি বাড়তি কঙ্কর সাথে নিবেন। যাতে কোনো কঙ্কর লক্ষভ্রষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট

স্থানের বাইরে পড়ে গেলে তা কাজে লাগানো যায়।

৪. মিনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট জামরা থেকে শুরু করবেন এবং মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট বড় জামরা দিয়ে শেষ করবেন।

৫. কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে। এদিন সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

«رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন সূর্য পূর্ণভাবে আলোকিত হওয়ার পর জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। আর পরের দিনগুলোতে (নিক্ষেপ করেছেন) সূর্য হেলে যাওয়া পর।”[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন এবং তারপর নিক্ষেপ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».

“আমরা অপেক্ষা করতাম। অতঃপর যখন সূর্য হেলে যেতো, তখন আমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম”।[১৫৭] তাছাড়া ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন,

«لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ».

“তিনদিন কঙ্কর মারা যাবে না সূর্য না হেলা পর্যন্ত”।[১৫৮]

সুতরাং সূর্য হেলে যাওয়ার পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল। আর এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁদের অনুসরণই আমাদের জন্য হিদায়াতের কারণ।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কেউ যদি সুন্নতের অনুসরণে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে যেন মৃতদের সুন্নাত অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফিৎনা থেকে নিরাপদ নয়’।[১৫৯]

তাছাড়া সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপে জায়েয হওয়ার পক্ষে সমকালীন কোন কোন আলেম যে মত দিয়েছেন, সেটা ১২ যিলহজের ব্যাপারে; ১১ যিলহজ নয়। তদুপরি সেটি কোনো গ্রহণযোগ্য মতও নয়।

৬. প্রথমেই আসতে হবে জামরায়ে ছুগরা বা ছোট জামরায়। মিনার মসজিদে

খাইফ থেকে এটিই সবচে’ কাছে। সেখানে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। যে দিক থেকেই নিক্ষেপ করুন সমস্যা নেই। এ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়ে গেলে, নিক্ষেপস্থল থেকে দ্বিতীয় জামরার দিকে সামান্য অগ্রসর হবেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে দো‘আ করবেন। এ সময় কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা মুস্তাহাব।

৭. এরপর দ্বিতীয় জামরা অভিমুখে রওয়ানা করবেন এবং পূর্বের ন্যায় সেখানেও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক

এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। যেকোন দিক থেকেই নিক্ষেপ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। এ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা শেষ হলে নিক্ষেপস্থল থেকে সামান্য সরে আসবেন এবং হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ দো‘আ করবেন।

৮. এরপর তৃতীয় জামরাতে আসবেন। এটি বড় জামরা, যা মক্কা থেকে অধিক নিকটবর্তী। সেখানেও প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এক এক করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। নিক্ষেপ করা হয়ে গেলে সেখান থেকে সরে আসবেন, কিন্তু দো‘আর জন্য

দাঁড়াবেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে দাঁড়ান নি।[১৬০]

৯. হাজী সাহেব পুরুষ হোন বা মহিলা- নিজেই নিজের কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, এটাই ওয়াজিব। তবে যদি নিজের পক্ষে কষ্টকর হয়ে যায়, যেমন অসুস্থ বা দুর্বল মহিলা অথবা বৃদ্ধা বা শিশু ইত্যাদি, তবে সেক্ষেত্রে দিনের শেষে অথবা রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। তাও সম্ভব না হলে অন্য কোনো হাজীকে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন, যিনি তার হয়ে নিক্ষেপ করবেন।

১০. কোন হাজী সাহেব যখন অন্যের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হবেন, তখন প্রতিনিধি হাজী প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন, তারপর তার মক্কেলের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবেন।

.১১এ দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ করার সর্বশেষ সময় সম্পর্কে প্রমাণ্য কোন বর্ণনা নেই। তবে উত্তম হলো সূর্যাস্তের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। যদি রাতে নিক্ষেপ করে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, বিভিন্ন বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরাম থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. এ দিনের অন্যান্য আমলের মধ্যে একটি আমল হলো, মিনায় রাত্রিযাপন করা। যেমনটি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. ইমাম বা ইমামের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করবেন। এ খুতবায় তিনি দীনের বিষয়সমূহ তুলে ধরবেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। বনূ বকর গোত্রের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

«رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى».

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে খুতবা প্রদান করতে দেখেছি, তখন আমরা ছিলাম তার সাওয়ারির কাছে। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা যা তিনি মিনায় প্রদান করেছিলেন।”[১৬১]

১৪. এও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ দিনটি আইয়ামে তাশরীকের অন্যতম। আর আইয়ামে তাশরীক হলো আল্লাহর যিকির করার দিন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ স্থানটি হচ্ছে মিনা। আর মিনা হারাম শরীফেরই একটা অংশ। তাই হাজীদের কর্তব্য স্থান,

কাল ও অবস্থার মর্যাদা অনুধাবন করে তদানুযায়ী চলা ও আমল করা। সময়টাকে আল্লাহ তা‘আলার যিকির, তাকবীর বা অন্য কোন নেক আমলের মাধ্যমে কাজে লাগানো এবং সব রকমের অন্যায়, অপরাধ, ঝগড়া, অনর্থক ও অহেতুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা।

১২ যিলহজের আমল

১২ যিলহজের আমল পুরোপুরি ১১ যিলহজের আমলের মতই। এ দিনে হাজী সাহেবগণ সাধারণত ‘মুতা‘আজ্জিল’ তথা দ্রুতপ্রস্থানকারী এবং ‘মুতা’আখখির’ তথা ধীরপ্রস্থানকারী-

এ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

“অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু’দিনে চলে আসবে। তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

এখানে ‘যে তাড়াহুড়া করে’ বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের হজ সমাপ্ত করার জন্য এদিনই মিনা থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ‘যে বিলম্ব করবে’ বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা এদিন (মিনা ছেড়ে) যান না; বরং মিনাতেই অবস্থান করেন এবং পরদিন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ শেষ করে তারপর মিনা ছেড়ে যান। ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করাই উত্তম। কারণ,

ক. আল্লাহ্ তা‘আলা শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতেই তাড়াতাড়ি করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমনটি উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আর তাকওয়ার ব্যাপারটি মানুষের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পায়। অনেকেই হজের কাজ থেকে বিরক্ত হয়ে শেষ দিন কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করে থাকেন। আবার অনেকে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় মিনা ত্যাগ করে চলে যান। এটি সম্পূর্ণরূপে তাকওয়ার পরিপন্থী। কাজেই হাজী সাহেবের মোটেও এমন করা উচিৎ নয়।

খ. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু

অনুসরণের মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

মুতা‘আজ্জেল হাজী সাহেবদের করণীয়

এদিন হাজীদের প্রধান কাজ হচ্ছে, জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ। তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পাথর মারার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে:

- এগার তারিখের ন্যায় প্রথমে মসজিদুল খাইফ এর নিকটস্থ ছোট জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে কিছুটা সরে

এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

· তারপর মধ্যম জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে করে বাম দিকে সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

· তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে করে এ স্থান ত্যাগ

করতে হবে। এখানে কোনো দো‘আ নেই।

· মুতা‘আজ্জেলে হাজীদের জন্য এদিন মিনা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বের হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। সূর্য অস্ত গেলে আর বের হবেন না। সেক্ষেত্রে মুতা’আখখেরে হাজীদের বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তারা রাত্রিযাপন করবেন এবং পরের দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কারণ, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ».

“আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি দিকে (১২ তারিখে) যে ব্যক্তি মিনায় থাকতে সূর্য ডুবে যায়, সে যেন পরদিন কঙ্কর নিক্ষেপ না করে (মিনা থেকে) প্রস্থান না করে।”[১৬২]

· যদি দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং চেষ্টা করছেন তারপরও কোন কারণে বের হতে পারেননি বা পথিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে। তবে তারা অধিকাংশ আলেমের মতে মুতা‘আজ্জেলে থাকবেন এবং বের হয়ে যেতে পারবেন। অনুরূপভাবে মুতা‘আজ্জেল হাজীগণ যদি মিনায় তাদের কোন সামগ্রী রেখে আসেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা

থেকে বের হয়ে যান, তাহলে তারাও ফিরে গিয়ে তা নিয়ে আসতে পারবেন। এ জন্য আর পরদিন থাকতে হবে না।

· এ কাজের মধ্য দিয়েই মুতা‘আজ্জেল হাজীগণ হজের কার্যাদি সমাপ্ত করবেন। অবশিষ্ট থাকল বিদায়ী তাওয়াফ। তার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

মুতাআখখের হাজী সাহেবদের জন্য ১৩ যিলহজের করণীয়

· ‘মুতা’আখখের’ হাজীগণ যখন ১২ তারিখ দিবাগত বা ১৩ তারিখের রাত মিনায় যাপন করবেন, তখন পরের দিন

তাদেরকে তিনি জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

· সে রাত্রি তাদেরকে আল্লাহর যিকিরে কাটাতে হবে। কারণ, এটিই মিনায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য।

· ১৩ তারিখে হাজীদের প্রধান কাজ হচ্ছে, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা। তাদেরকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পাথর মারার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে:

· ১২ তারিখের ন্যায় প্রথমে মসজিদুল খাইফ-এর নিকটস্থ ছোট জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ব

বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে একটু সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

· তারপর মধ্য জামরায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে একটু সরে এসে কিবলামুখী হয়ে দো‘আ করতে হবে।

· তারপর বড় জামরা তথা জামরাতুল-আকাবায় পাথর মারতে হবে। পূর্ববর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ‘আল্লাহু

আকবার’ বলে একে একে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। এখানে কোনো দো‘আ নেই।

এ কাজের মধ্য দিয়েই মুতাআখখের হাজী সাহেবগণ হজের কার্যাদি সমাপ্ত করবেন। বাকি থাকল বিদায়ী তাওয়াফ। তাও সেসব হাজী সাহেবের জন্য যারা মক্কার অধিবাসী নন। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

-

বিদায়ী তাওয়াফ

মুতা‘আজ্জেল বা দ্রুতপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১২ যিলহজ এবং মুতাআখখের বা ধীরপ্রস্থানকারী হাজীগণ ১৩ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পন্ন করবেন। তখনই তাদের হজের কার্যাদি শেষ হয়ে যাবে। তবে যদি তারা মক্কার অধিবাসী না হয়ে থাকেন, তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ করা ছাড়া তাদের জন্য মক্কা থেকে বের হওয়া জায়েয হবে না। কারণ বাইরের লোকদের জন্য হজের বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।

বিদায়ী তাওয়াফের পদ্ধতি

বিদায়ী তাওয়াফ অন্য তাওয়াফের মতই। তবে এ তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করা হয়। তাওয়াফ

হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হয়। এর সাতটি চক্করে কোন রমল নেই; ইযতবিাও নেই। তাওয়াফ শেষে করার পর দু’রাকাত তাওয়াফরে সালাত আদায় করতে হবে। মাকামে ইবরাহীমরে সামনে সম্ভব না হলে হারামরে যেকোনো জায়গায় আদায় করবেন। এ তাওয়াফরে পর কোন সা‘ঈ নেই।

বিদায়ী তাওয়াফ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

- এ তাওয়াফটি হারাম শরীফকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিদায়ী সালামরে মত। সুতরাং বাইতুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট তার সর্বশেষে দায়িত্ব হবে এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা। হাদীসে এসছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.»

“তোমাদের কেউ যেন তার সর্বশেষ কাজ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ না করে।’[১৬৩]

তেমনি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.»

“লোকদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, বাইতুল্লাহর সাথে তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় তাওয়াফ করা।

তবে মাসিক স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা শিথিল করা হয়েছে।”[১৬৪]

· কিন্তু মাসিক স্রাবগ্রস্ত মহিলা যারা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তাদের জন্য সম্ভব হলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং পবিত্রতা অর্জন শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন। এটাই উত্তম। অন্যথায় তাদের থেকে এই তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। কারণ বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার হায়েয এসে যাওয়ায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি

তাওয়াফে ইফাযা করেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে সে এখন যেতে পারবে।’[১৬৫]

· হাজী সাহেবদের সর্বশেষ আমল হবে এই তাওয়াফ। এটি ওয়াজিব। এরপর আর দীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান করা যাবে না। করলে পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। তবে যদি সামান্য সময় অবস্থান করে, যেমন কোন সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা, খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অপেক্ষা কিংবা উপহার সামগ্রীর জন্য অপেক্ষা। এ জাতীয় কোন বিষয় হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। এমনিভাবে হাজী সাহেব যদি কোন

কারণে পূর্বে হজের তাওয়াফের সা‘ঈ না করে থাকেন, তাহলে তিনি বিদায়ী তাওয়াফের পরে সা‘ঈ করবেন। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা এটা সামান্য সময় বলে বিবেচিত।

-

এক নজরে হজ-উমরা

হজের রুকন তথা ফরযসমূহ

(১) ইহরাম তথা হজ শুরু করার নিয়ত করা।

(২) আরাফায় অবস্থান।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা।

(৪) অধিকাংশ শরীয়তবিদের মতে সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা। (ইমাম আবু হানিফা রহ. এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।)

[এসব রুকনের কোনো একটি ছেড়ে দিলেও হজ হবে না।]

হজের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা।

২. ‘আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩. মুযদালিফায় রাত যাপন।

৪. কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৫. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৬. আইয়ামে তাশরীকের রাতসমূহ মিনায় যাপন।

৭. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এসব ওয়াজিবের কোনো একটি ছেড়ে দিলে, দম অর্থাৎ পশু যবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উমরার রুকন বা ফরযসমূহ

ইহরাম তথা উমরা শুরু করার নিয়ত করা।

বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

সাফা ও মারওয়ায় সা‘ঈ করা।

উমরার ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৩. আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. মাথার চুল কাট-ছাঁট বা পুরোপুরি মুণ্ডন করা।

২. হাত বা পায়ের নখ কর্তন বা উপড়ে ফেলা।

৩. ইহরাম বাঁধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দু’টির সাথে সম্পৃক্ত অন্য

কিছুতে সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করা।

৪. বিবাহ করা, বিবাহ দেওয়া বা বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো।

৫. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।

৬. ইহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা।

৭. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা।

৮. মাথা আবৃত করা (পুরুষদের জন্য)।

৯. পুরো শরীর ঢেকে নেওয়ার মতো পোশাক কিংবা পাজামার মতো অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক পরিধান

করা। যেমেন, জামা বা পাজামা পরিধান করা (পুরুষদেরে জন্য)।

১০. হাত মোজা ব্যবহার করা (মহিলাদেরে জন্য)।

১১. নেকাব পরা (মহিলাদেরে জন্য)।

-

এক নজরে তামাত্তু হজ

৮ যিলহজেরে পূর্বে তামাত্তু হজ পালনকারীর করণীয়

১- মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা। উমরা আদায়েরে নিয়ত করে মুখে বলা, عُمْرَةً لَبَّيْكَ (লাব্বাইকা উমরাতান)। বায়তুল্লাহর

তাওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত সাধ্যমত তালবিয়া পাঠ করতে থাকা।

২- বায়তুল্লাহে পৌঁছে উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করা।

৩- উমরার সা‘ঈ সম্পাদন করা।

৪- মাথার চুল ছোট করা অথবা মাথা মুণ্ডন করা। তবে এ উমরার ক্ষেত্রে ছোট করাই উত্তম। এরপর গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে স্বাভাবিক কাপড় পরে নেয়া। অন্য কোন উমরা না করে ৮ যিলহজ পর্যন্ত হজের ইহরামের অপেক্ষায় থাকা। এ সময়ে নফল তওয়াফ, কুরআন তিলাওয়াত, জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়,

হাজীদের সেবা ও যিলহজের দশদিনের ফযীলত অধ্যায়ে লিখিত আমলসমূহ প্রভৃতি নেক আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

৮ যিলহজ

নিজ অবস্থান স্থল থেকে হজের নিয়তে لَبَّيْكَ حَجّاً (লাব্বাইকা হাজ্জান) বলে ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন করা। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিনের ফজরের সালাত নিজ নিজ ওয়াক্তে দু'রাকাত করে আদায় করা।

৯ যিলহজ (‘আরাফা দিবস)

১) ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পর ‘আরাফায় রওয়ানা হওয়া। সেখানে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে যোহর ও আসর দুই ওয়াক্তের সালাত এক আযান ও দুই ইকামতে দু’রাকাত করে একসাথে আদায় করা। সালাত আদায়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো‘আ ও যিকিরে মশগুল থাকা। সাধ্যমত উভয় হাত তুলে দো‘আ করা।

২) সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়া।

৩) মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামতে, মাগরিব ও ইশার সালাত একসাথে আদায় করা।

ইশার সালাত কসর করে দু’রাকাত পড়া এবং সাথে সাথে বিতরের সালাতও আদায় করে নেওয়া।

৪) মুযদালিফায় রাত যাপন। ফজর হওয়ার পর আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করা। আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দো‘আ মোনাজাতে মশগুল থাকা।

৫) মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে তবে জরুরী নয়। ৫৯ বা ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করা। মিনা থেকেও কঙ্কর সংগ্রহ করা যেতে পারে। পানি দিয়ে কঙ্কর ধৌত করার কোনো বিধান নেই।

৬) সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় রওয়ানা হওয়া। তবে দুর্বলদের ক্ষেত্রে মধ্য রাতের পর মিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়া জায়েয।

১০ যিলহজ

১। তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। নিক্ষেপের সময় প্রত্যেকবার ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর’ অথবা ‘আল্লাহু আকবর’ বলা।

২। হাদী তথা পশু যবেহ করা, অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে থাকলে হাদী যবেহ হয়েছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

হারামের অধিবাসীদের ওপর হাদী যবেহ করা ওয়াজিব নয়।

৩। মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। মুণ্ডন করাই উত্তম। মহিলাদের ক্ষেত্রে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণ ছোট করা।

৪। মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে ইহরাম হতে বেরিয়ে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাওয়া, এতে স্বামী-স্ত্রী মেলা-মেশা ছাড়া ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্যসব বিষয় বৈধ হয়ে যাবে।

৫। তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা তথা ফরয তাওয়াফ সম্পাদন করা। এ ক্ষেত্রে এগার ও বার তারিখ

সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। অধিকাংশ শরী‘আতবিদের মতে এরপরেও আদায় করা যাবে, তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সেরে নেওয়া ভালো।

৬। সা‘ঈ করা ও পুনরায় মিনায় গমন।

৭ । ১০ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মেলা-মেশাও বৈধ হয়ে যায়।

১১ যিলহজ

সূর্য পশ্চিমে আকাশে হেলে যাওয়ার পর ছোট, মধ্য, বড় জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরায় শেষ করা। ছোট ও মধ্য জামরায় নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু’হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা।

১২ যিলহজ

১। ১২ তারিখ অর্থাৎ ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় রাতযাপন।

২। সূর্য পশ্চিমে আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনি জামরার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। শুধু ছোট ও

মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু’হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দো‘আ করা।

হাজীদের জন্য ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা অতিক্রম করতে হবে। সেদিনই যদি কাউকে মক্কা ছেড়ে যেতে হয় তাহলে মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করা।

৩। ১২ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করা উত্তম। ১২ তারিখের রাত মিনায় যাপন করলে ১৩ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর ছোট, মধ্য ও বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা।

১৩ যিলহজ

১। সূর্য হেলে যাওয়ার পর পর ছোট, মধ্য ও বড় জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ। ছোট জামরা থেকে শুরু করে বড় জামরাতে গিয়ে শেষ করবে। শুধু ছোট ও মধ্য জামরাতে নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দু’হাত উঠিয়ে দো‘আ করবে।

২। মিনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে যাত্রা এবং মক্কা ত্যাগের আগে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পাদন করা। তবে প্রসূতি ও স্রাবগ্রস্ত মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ না করার অনুমতি আছে।

হজের তালবিয়া নিম্নরূপ

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ»

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা)

“আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নি'আমত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।”

তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী থেকে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়ার বিশেষ দো‘আ

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

(রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আযাবান নার) “হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে বাঁচাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

‘আরাফা দিবসের বিশেষ দো‘আ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর)

“আল্লাহ ছাড়া হক্ব কোন মা‘বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”

হজের পরিসমাপ্তি

হাজী সাহেব হজের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর অধিক পরিমাণে যিকির ও

ইস্তিগফার করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ٢٠٠ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢﴾ [البقرة: ١٩٩- ٢٠٢]

“অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে

স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে তার হিস্যা তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১-২০২]

স্বদেশে ফেরার সময় সফরের আদবসমূহ এবং দো‘আ আমলে নেবেন। সফরসঙ্গী ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সদয় ও উন্নত আচরণ করবেন। যদি তাদের রীতি এমন হয়ে থাকে যে, সেখানে হাদিয়া নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তাদের মনোতুষ্টির জন্য হাদিয়া নিয়ে যাবেন।

হাজী সাহেবদের জন্য মদীনা শরীফ যিয়ারত করা অপরিহার্য নয়। মদীনার যিয়ারত বরং একটি স্বতন্ত্র সুন্নাত। হজের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। হজের আলোচনার সাথে এর আলোচনা হয়ে থাকে, কেননা অনেক মানুষ অনেক দূর-দুরান্ত থেকে আসেন। আলাদা আলাদাভাবে দুজায়গা সফরের

লক্ষ্যে দুবার আসা কষ্টকর বিধায় এক সঙ্গেই তারা দু’জায়গায় সফর করেন।

হাজী সাহেবদের জন্য সমীচীন হলো, দৃঢ় ঈমান, নতুন প্রত্যয়-উপলব্ধি এবং অনেক বেশি আনুগত্য, ইবাদত ও উন্নত চরিত্র নিয়ে ফিরে আসা। কারণ, হজের মধ্য দিয়ে যেন তার নব জন্ম ঘটে। (হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।)

মদীনার যিয়ারত

পবিত্র মক্কার ন্যায় মদীনাও পবিত্র ও সম্মানিত শহর, ওহী নাযিল হওয়ার স্থান। পবিত্র কুরআনের প্রায় অর্ধেক নাযিল হয়েছে মদীনায়। মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ঈমানের আশ্রয়স্থল। মুহাজির ও আনসারদের মিলনভূমি। মুসলমানদের প্রথম রাজধানী। এখান থেকেই আল্লাহর পথে জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল, আর এখান থেকেই হিদায়াতের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে। ফলে আলোকিত হয়েছে সারা বিশ্ব। এখান থেকে সত্যের পতাকাবাহী মু'মিনগণ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ডেকেছেন। নবীজীর শেষ দশ বছরের

জীবন যাপন, তাঁর মৃত্যু ও কাফন-দাফন এ ভূমিতেই হয়েছে। এ ভূমিতেই তিনি শায়িত আছেন। এখান থেকেই তিনি পুনরুত্থিত হবেন। নবীদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কবরই সুনির্ধারিত রয়েছে। তাই মদীনার যিয়ারত আমাদেরকে ইসলামের সোনালী ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে সাহায্য করে। সুদৃঢ় করে আমাদের ঈমান-আকীদার ভিত্তি।

হজের সাথে মদীনা যিয়ারতের যদিও কোন সংশ্লিষ্টতা নেই; কিন্তু হজের সফরে যেহেতু মদীনায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, সেহেতু যারা বহির্বিশ্ব থেকে হজ করতে আসে তাদের জন্য

বিশেষভাবে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটাই কাম্য।

মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা

মদীনা যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা হলো, মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। কেননা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى».

“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের দিকে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে)

সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা।”[১৬৬]

এ হাদীসের আলোকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالسَّفَرِ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ دُونَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِهِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلاَفٌ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

“সফরকারীর সফরের উদ্দেশ্য যদি শুধু নবীর কবর যিয়ারত হয়, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা না হয়, তাহলে এই মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে। যে কথার ওপর ইমামগণ এবং অধিকাংশ

শরী‘আত বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেছেন তা হলো, এটা শরী‘আতসম্মত নয়।”[১৬৭]

ইবন তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, ‘জেনে রাখো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত বহু ইবাদত থেকে মর্যাদাপূর্ণ, অনেক নফল কর্ম থেকে উত্তম; কিন্তু সফরকারীর জন্য শ্রেয় হচ্ছে, সে মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করবে। অতপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত করবে এবং তাঁর ওপর সালাত ও সালাম পেশ করবে।’[১৬৮]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْصُدُوْنَ مَوَاضِعَ مُعَظَّمَةً بِزَعْمِهِمْ يَزُوْرُوْنَهَا، وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا، وَفِيْهِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالْفَسَادِ مَا لاَ يَخْفَى، فَسَدَّ النَّبِيُّ ﷺ الْفَسَادَ لِئَلاَّ يَلْتَحِقَ غَيْرُ الشَّعَائِرِ بِالشَّعَائِرِ، وَلِئَلاَّ يَصِيْرَ ذَرِيْعَةً لِعِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، وَالْحَقُّ عِنْدِيْ أَنَّ الْقَبْرَ وَمَحَلَّ عِبَادَةِ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَالطُّوْرَ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي النَّهْيِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

‘জাহেলী যুগের মানুষেরা তাদের ধারণামতে মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহকে উদ্দেশ্য করে তা যিয়ারত করত এবং তার মাধ্যমে (তাদের ধারণামতে) বরকত লাভ করত। এতে রয়েছে সত্যচ্যুতি, বিকৃতি ও ফাসাদ যা কারো

অজানা নয়। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফাসাদ চিরতরে বন্ধ করে দেন, যাতে শা‘আয়ের[১৬৯] নয় এমন বিষয়গুলো শা‘আয়ের-এর অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং যাতে এটা গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়। আমার মতে সঠিক কথা হচ্ছে, কবর ও আল্লাহর যে কোনো অলীর ইবাদতের স্থান, তূর পাহাড় ইত্যাদি সবকিছু উপরোক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।[১৭০]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ بِنِيَّةِ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ يُسْتَحَبُّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ ﷺ أَيْضًا، لأَنَّهُ يَصِيْرُ حِيْنَئِذٍ مِنْ حَوَالَيِ الْبَلْدَةِ، وَزِيَارَةُ قُبُوْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَهُ.

‘হ্যাঁ, সফকারির জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে সফর করা। আর এটা নৈকট্য লাভের অন্যতম বড় উপায়। অতপর সে যখন মদীনা পৌঁছবে, তখন তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। কেননা তখন সে মদীনা নগরীতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তখন নগরীতে অবস্থিত কবরগুলো যিয়ারত করা

অবস্থানকারির ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।’[১৭১]

সুতরাং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে মদীনা যিয়ারত করতে হবে। কবর যিয়ারতের নিয়তে মদীনা যিয়ারত হলে তা সহীহ হবে না। মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর-কেন্দ্রিক সকল উৎসব জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

«وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»

“আর আমার কবরকে তোমরা উৎসবের উপলক্ষ্য বানিও না।”[১৭২] অর্থাৎ আমার কবর-কেন্দ্রিক নানা

অনুষ্ঠানের আয়োজন করো না। এই নিষিধোজ্ঞার মধ্যে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও শামিল।’[১৭৩]

মদীনার ফযীলত

মদীনাতুর রাসূলের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. মক্কার ন্যায় মদীনাও পবিত্র নগরী। মদীনাও নিরাপদ শহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ»

“নিশ্চয় ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম।”[১৭৪]

২. মদীনা যাবতীয় অকল্যাণকর বস্তুকে দূর করে দেয়। জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا».

“মদীনা হলো হাপরের মতো, এটি তার যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয় এবং তার কল্যাণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে।”[১৭৫]

৩. শেষ যামানায় ঈমান মদীনায় এসে একত্রিত হবে এবং এখানেই তা ফিরে আসবে। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إلى المَدِيْنَةِ كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحْرِها»

‘নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।’[১৭৬]

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য বরকতের দো‘আ করেছেন। আনাস ইবন মালেকে

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

“হে আল্লাহ, আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।”[১৭৭]

· আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَللَّهمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا».

“হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দাও। আমাদের এ মদীনায় বরকত দাও। আমাদের সা‘তে বরকত দাও এবং আমাদের মুদ-এ বরকত দাও।”[১৭৮]

· আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّى دَعَوْتُ فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ».

“ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য

দো‘আ করেছেন। যেমনিভাবে ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা কারেছেন, আমিও তেমনি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা‘ ও মুদ-এর বরকতের দো‘আ করেছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো‘আ করেছেন।”[১৭৯]

৫. মদীনায় মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন,

«عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ».

“মদীনার প্রবেশদ্বারসমূহে ফেরেশেতারা প্রহরায় নিযুক্ত আছেন, এতে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।”[১৮০]

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا».

“যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ করে। কেননা মদীনায় যে মারা যাবে আমি তার পক্ষে সুপারিশ করব।”[১৮১]

৭. নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে হারাম ঘোষণার প্রাক্কালে এর মধ্যে কোন বিদ‘আত বা অন্যায় ঘটনা ঘটানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثاً أَو آوَى مُحدِثاً فَعلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَاسِ أَجمَعِينَ، لاَ يَقبَلُ اللهُ مِنهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً»

“মদীনা ‘আইর’ থেকে ‘সাওর’ পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি মদীনায় কোনো বিদ‘আত কাজ করবে অথবা কোনো

বিদ‘আতীকে আশ্রয় প্রদান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লা‘নত পড়বে। তার কাছ থেকে আল্লাহ কোনো ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।”[১৮২]

মদীনায় অনেক স্মৃতি বিজড়িত ও ঐতিহাসিক স্থানের যিয়ারত করতে হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা, বাকী‘র কবরস্থান, উহুদের শহীদদের কবরস্থান ইত্যাদি। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে এসব স্থানের ফযীলত ও যিয়ারতের আদব উল্লেখ করা হলো।

মসজিদে নববীর ফযীলত

মসজিদে নববীর রয়েছে ব্যাপক মর্যাদা ও অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণা এসেছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨﴾ [التوبة: ١٠٨]

“অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা

অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরে ভালোবাসেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আল্লামা সামহূদী বলেন, ‘কুবা ও মদীনা- উভয় স্থানের মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত আয়াতে তাই উভয় মসজিদের কথা বলা হয়েছে।’[১৮৩]

মসজিদে নববীর আরেকটি ফযীলত হলো, এতে এক নামায পড়লে এক হাজার নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে ছয় মাস বেশি দিন সালাত পড়ার সমতুল্য। ইবন উমার

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

“আমার এ মসজিদে এক সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।”[১৮৪]

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلصَّلاَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ»

“মসজিদে হারামে এক সালাত এক লাখ সালাতের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক সালাত এক হাজার সালাতের সমান এবং বাইতুল-মুকাদ্দাসে এক সালাত পাঁচশ সালাতের সমান।”[১৮৫]

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى»

“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সওয়াবের আশায়) সফর করা জায়েয নেই: মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।”[১৮৬]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ»

“যে আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য আসবে, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।

পক্ষান্তরে যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের মাল-সামগ্রীর প্রতি তাকায়।”[১৮৭]

আবূ উমামা আল-বাহলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ غدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يعلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ.»

“যে ব্যক্তি একমাত্র কোনো কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজের সাওয়াব লেখা হবে।”[১৮৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর (সাইয়্যেদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর) ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটুকুকে জান্নাতের অন্যতম উদ্যান বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ.»

“আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান)।”[১৮৯]

রওযা শরীফ ও এর আশপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। এসবের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পূর্ব দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফ। তার পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যখানে তাঁর মিহরাব এবং পশ্চিমে মিম্বর। এখানে বেশ কিছু পাথরের খুঁটি রয়েছে। সেসবের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও স্মৃতি, যা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এসব খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। এগুলো ছিল: ১. উসতুওয়ানা আয়েশা বা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুঁটি। ২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রতিনিধি দলের খুঁটি। ৩. উসতুওয়ানাতুত-তাওবা

বা তাওবার খুঁটি। এটিকে উসতুয়ানা আবূ লুবাবাও বলা হয়। ৪. উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা সুগন্ধি জ্বালানোর খুঁটি। ৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাটের সাথে লাগোয়া খুঁটি। এবং ৬. উসতুওয়ানাতুল-হারছ বা মহিরাছ তথা পাহাদারদের খুঁটি।

মুসলিম শাসকদের কাছে এই রওযা বরাবরই ছিল খুব গুরুত্ব ও যত্নের বিষয়। উসমানী সুলতান সলীম রওযা শরীফের খুঁটিগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত লাল-সাদা মারবেল পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দেন। অতপর আরেক উসমানী সুলতান আবদুল মাজীদ এর খুঁটিগুলোর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯৯৪

সালে সৌদি সরকার পূর্ববর্তী সকল বাদশাহের তুলনায় উৎকৃষ্ট পাথর দিয়ে এই রওযার খুঁটিগুলো ঢেকে দেন এবং রওযার মেঝেতে দামী কার্পেট বিছিয়ে দেন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের আদব

আবাসস্থল থেকে উযূ-গোসল সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ধীরে-সুস্থে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে গমন করবেন। আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবেন। নিচের দো‘আ পড়তে পড়তে ডান পা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

(আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ-তাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা)।

“আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’[১৯০] আল্লাহর নামে

আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।”[১৯১]

অতপর যদি কোনো ফরয সালাতের জামাত দাঁড়িয়ে যায় তবে সরাসরি জামাতে অংশ নিন। নয়তো বসার আগেই দু’রাকাত তাহিয়্যিাতুল মসজিদ পড়বেন। আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু’রাকাত সালাত পড়ে তবেই বসে।’[১৯২]

আর সম্ভব হলে ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে রওযার সীমানার মধ্যে এই সালাত পড়বেন। কারণ, আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا بَينَ بَيْتِي ومِنْبَرِيْ رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ.»

“আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াযিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান)।”[১৯৩]

আর সম্ভব না হলে মসজিদে নববীর যেখানে সম্ভব সেখানেই পড়বেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদের এ অংশকে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক গুণে গুণান্বিত করা দ্বারা এ অংশের আলাদা ফযীলত ও বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। আর সে শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত অর্জিত হবে কাউকে কষ্ট না দিয়ে সেখানে নফল সালাত আদায় করা, আল্লাহর যিকির করা, কুরআন পাঠ করা দ্বারা। তবে ফরয সালাত প্রথম কাতারগুলোতে পড়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا.»

“পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম কাতার হলো প্রথমটি, আর সবচেয়ে খারাপ কাতার হলো শেষেটি।”[১৯৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَولِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إلا أَن يَّسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ.»

“মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত জানত, তারপর লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে অবশ্যই তারা তার জন্য লটারি করত।”[১৯৫]

সুতরাং এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, মসজিদে নববীতে নফল সালাতের উত্তম জায়গা হলো রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত। আর ফরয সালাতের জন্য উত্তম জায়গা হলো প্রথম কাতার তারপর তার নিকটস্থ কাতার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবর যিয়ারত

তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা ফরয সালাত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের কবরে সালাম নিবেদন করতে যাবেন।

১. কবরের কাছে গিয়ে কবরের দিকে মুখ দিয়ে কিবলাকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে বলবেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى اللهُ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

(আস্‌সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সাল্লাল্লাহু ও সাল্লামা ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া জাযাকা আফদালা মা জাযাল্লাহু নাবিয়্যান ‘আন উম্মাতিহি)।

“হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। আল্লাহ আপনার ওপর সালাত, সালাম ও বরকত প্রদান করুন।

আর আল্লাহ কোন নবীর প্রতি তার উম্মতের পক্ষ থেকে যত প্রতিদান তথা সাওয়াব পৌঁছান, আপনার প্রতি তার থেকেও উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব প্রদান করুন।”

আর যদি এ ধরনের অন্য কোনো উপযুক্ত দো‘আ পড়েন তবে তাও পড়তে পারেন।

২. অতপর ডান দিকে এক হাত এগিয়ে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের সামনে যাবেন। সেখানে পড়বেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ فِي أُمَّتِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمة محمد خيراً.

(আস্সালামু ‘আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ফী উম্মাতিহী, রাদিয়াল্লাহু ‘আনকা ওয়া জাযাকা ‘আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা)।

৩. এরপর আরেকটু ডানে গিয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের সামনে দাঁড়াবেন। সেখানে বলবেন,

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ محمدٍ خيراً.

(আস্সালামু আলাইকা ইয়া উমার, আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন, রাদিয়াল্লাহু ‘আনকা ওয়া

জাযাকা ‘আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা।)

তারপর এখান থেকে চলে আসবেন। দো‘আর জন্য কবরের সামনে, পিছনে, পূর্বে বা পশ্চিমে- কোনো দিকেই দাঁড়াবেন না। ইমাম মালেক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে শুধু সালাম জানানোর জন্য দাঁড়াবে, তারপর সেখান থেকে সরে আসবে। যেমনটি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা করতেন। ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, শুধু নিজের দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের সামনে যাওয়া মাকরূহ। ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, দো‘আ চাওয়ার জন্য কবরের

কাছে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করা মাকরূহ।[১৯৬]

কবর যিয়ারতের সময় নিচের আদবগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন:

· রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখবেন। উচ্চস্বরে কোনো কথা বলবেন না।

· ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে অন্যকে কষ্ট দিবেন না।

· কবরের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না।

মদীনায় যেসব জায়গা যিয়ারত করা সুন্নাত

১. বাকী‘র কবরস্থান

২. মসজিদে কুবা’

৩. শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান

বাকী‘র কবরস্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বাকী‘ মদীনাবাসির প্রধান কবরস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মদীনায় মৃত্যু বরণকারী হাজার হাজার ব্যক্তির কবর রয়েছে এখানে। এদের

মধ্যে রয়েছে স্থানীয় অধিবাসী এবং বাইরে থেকে আগত যিয়ারতকারীগণ। এখানে প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন (খাদীজা ও মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী, কন্যা ফাতেমা, পুত্র ইবরাহীম, চাচা আব্বাস, ফুফু সাফিয়্যা, নাতী হাসান ইবন আলী এবং জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়াও অনেক মহান ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বাকী‘র কবরস্থান যিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি বলতেন,

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ».

(আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন ওয়া আতাকুম মা তূআ'দুনা গাদান মু'আজ্জালূনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন, আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকী'ইল গারকাদ)।

"তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মু'মিনদের ঘর, তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছিল তা তোমাদের কাছে এসেছে। আর আগামীকাল (কিয়ামত) পর্যন্ত তোমাদের সময় বর্ধিত করা হলো। আর ইনশাআল্লাহ তোমাদের

সাথে আমরা মিলিত হব। হে আল্লাহ, বাকী‘ গারকাদের অধিবাসীদের ক্ষমা করুন।”[১৯৭]

তাছাড়া কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা বাকী‘উল গারকাদে যাদের দাফন করা হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমার কাছে জিবরীল এসেছিলেন ...তিনি বলছেন,

«إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»

“আপনার রব আপনাকে বাকী‘র কবরস্থানে যেতে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন।”

একদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কীভাবে তাদের জন্য দো‘আ করবো? তিনি বললেন, তুমি বলবে,

«السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ».

(আসসালামু ‘আলা আহলিদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতা’খিরীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন)।

“মুমিন-মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর সালাম। আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ওপর রহম করুন। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।”[১৯৮]

মসজিদে কুবা

মদীনা পল্লীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ এটি। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কুবা[১৯৯] পল্লীতে আমর ইবন আউফ গোত্রের কুলছূম ইবন হিদমের গৃহে অবতরণ করেন। এখানে তাঁর উট বাঁধেন। তারপর

এখানেই তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর নির্মাণকাজে তিনি স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ মসজিদে তিনি সালাত পড়তেন। এটিই প্রথম মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে প্রকাশ্যে একসঙ্গে নামায আদায় করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ মসজিদে নামায আদায় করতে চাইতেন। সপ্তাহে অন্তত একদিন তিনি এ মসজিদের যিয়ারতে গমন করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর অনুকরণে প্রতি শনিবার

মসজিদে কুবার যিয়ারত করতেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবারে হেঁটে ও বাহনে চড়ে মসজিদে কুবায় যেতেন।’[২০০]

মসজিদে কুবার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ»

“যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে কুবায় আসবে। তারপর এখানে সালাত পড়বে। তা তার জন্য একটি উমরার সমতুল্য।”[২০১]

শুহাদায়ে উহুদের কবরস্থান

২য় হিজরীতে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরস্থান যিয়ারত করা। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। এখানেই তাঁদেরকে কবর দেওয়া হয়। তাঁদের জন্য দো‘আ করা এবং তাঁদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা। সপ্তাহের যেকোন দিন যেকোন সময় সেখানে যিয়ারতে যাওয়া যায়। অনেকে জুমু‘আ বার বা বৃহস্পতিবার যাওয়া উত্তম মনে করেন, তা ঠিক নয়।

উপরোল্লিখিত স্থানগুলোতে যাওয়ার কথা হাদীসে এসেছে বিধায় সেখানে

যাওয়া সুন্নাত। এছাড়াও মদীনাতে আরো অনেক ঐতিহাসিক ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে। ইবাদত মনে না করে সেসব স্থান পরিদর্শন করাতে কোনো দোষ নেই। যেমন, মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে ইজাবা, মসজিদে জুমা‘, মসজিদে বনী হারেছা, মসজিদে ফাত্হ, মসজিদে মীকাত, মসজিদে মুসাল্লা ও উহুদ পাহাড় ইত্যাদি। কিন্তু কোনোক্রমেই সেগুলোকে ইবাদতের ক্ষেত্র বলে মনে করা যাবে না।

মসজিদে কিবলাতাইন

এটি একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। মদীনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে খাযরাজ

গোত্রের বানূ সালামা শাখা গোত্রে অবস্থিত। বনূ সালামা গোত্রের মহল্লায় অবস্থিত হওয়ার কারণে মসজিদে কিবলাতাইনকে মসজিদে বনী সালামাও বলা হয়। একই সালাত এই মসজিদে দুই কিবলা তথা বাইতুল-মুকাদ্দাস ও কা‘বাঘরের দিকে পড়া হয়েছিল বলে একে মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়।

বারা’ ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল-মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ষোল বা সতের মাস সালাত পড়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে

মনে কা‘বামুখী হয়ে সালাত পড়তে চাইতেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন,

﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: ١٤٤]

“আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমরা অবশ্যই দেখেছি। অতএব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৪] এ আয়াত নাযিল হবার

সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার দিকে ফিরে যান।”[২০২]

ইবন সা‘দ উল্লেখ করেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ সালামার উম্মে বিশর ইবন বারা’ ইবন মা‘রূর রাদিয়াল্লাহু আনহুএর সাক্ষাতে যান। সেখানে তাঁর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যেই যোহর সালাতের সময় ঘনিয়ে আসে। কোনো কোনো বর্ণনায় আসরের সালাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সবে মাত্র দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন, এরই মধ্যে

কা‘বামুখী হয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ আসে। সাথে সাথে তিনি কা‘বামুখী হয়ে যান এবং সেদিকে ফিরেই অবশিষ্ট দু’রাকাত আদায় করেন। এ কারণেই মসজিদটির নাম হয়ে যায় মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ।’[২০৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২।

[২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯২১।

[৩] ইবনুল আসীর, নিহায়া: ১/৩৪০।

[৪] ইবন কুদামা, আল-মুগনী: ৫/৫।

[৫] ড. সাঈদ আল-কাহতানী, আল-উমরাতু ওয়াল হাজ্জ ওয়ায যিয়ারা, পৃ. ৯।

[৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ৩৮।

[৭] আহমদ: ৪/৩৪২।

[৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৭১; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ৯৪৩১।

[৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৭২।

[১০] ফাতহুল বারী: ৪/১৮৬১।

[১১] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২/৫৫৭।

[১২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৫০।

[১৩] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১।

[১৪] ফাতহুল বারী: ৩/৩৮২।

[১৫] তিরমিযী, হাদীস নং ৮১০।

[১৬] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৪০০; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৮৯।

[১৭] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৩ ।

[১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৯৪।

[১৯] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১৪।

[২০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৩; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২৫৬।

[২১] তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর: ১১/৫৫।

[২২] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

[২৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১।

[২৪] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৭১৮।

[২৫] নাসাঈ, হাদীস নং ১৪; তরিমযিী, হাদীস নং ২৯৮৪।

[২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৫।

[২৭] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩০।

[২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

[২৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯১। কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ’র তাওয়াফ করার আগেই হাজীগণ হালাল হয়ে সাধারণ পবিত্র পোশাক পরে থাকেন। এ সময় ইহরাম অবশিষ্ট থাকে না বিধায় সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। স্মর্তব্য যে, ইহরাম থাকা অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

[৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯০।

[৩১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১৭৭।

[৩২] মুসনাদ, হদীস নং ৪৮৯৯; ইবন খুযাইমা, হদীস নং ২৬০১।

[৩৩] এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইবন আবদিল বার ইমামদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। আল ইজমা: ১৮, আত-তামহীদ, ১৫/১০৪।

[৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।

[৩৫] আত-তামহীদ: ১৫/১০৮।

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১৮৪।

[৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪।

[৩৯] ইবন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিল হাজ্জি ওয়াল উমরা: পৃ. ৭; ইবন তাইমিয়া, মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২৬/১০৮; শারহু উমদাতুল ফিকহ: ১/৪১৭; ইবন উসাইমিন, আল-মানহাজ লিমুরীদিল উমরাতি ওয়াল হাজ্জ: পৃ. ২৩।

[৪০] তিরমিযী, হাদীস নং ৮৩০; ইবন খুযাইমা, হদীস নং ২৫৯৫; বাইহাকী, হদীস নং ৮৭২৬।

[৪১] প্রাগুক্ত।

[৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯২৩; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১৭০।

[৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ২৯৫।

[৪৪] মুসনাদ আহমাদ, হদীস নং ৯৯৮৪; ইবন খুযাইমা, হদীস নং ১০৬২।

[৪৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২০৭।

[৪৬] নাসাঈ, হদীস নং ২৭৬৬।

[৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২১৮।

[৪৮] ইবন মাজাহ, হদীস নং ২৯২০।

[৪৯] মুসনাদ, হদীস নং ১৪৪৪০।

[৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৯, সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১১৮৪।

[৫১] আবু দাউদ, হদীস নং ১৮১৪।

[৫২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৪; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২৫৯। (বর্তমানে জারওয়াল এলাকায় অবস্থতি প্রসূতি হাসপাতালরে জায়গাটরি নাম ছলি যী-তুয়া।)

[৫৩] সহীহ বুখারী ৩/৪৩৬; সহীহ মুসলমি ২/৯১৯।

[৫৪] আবূ দাউদ, হদীস নং ১৯৩৭।

[৫৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৭৬।

[৫৬] প্রাগুক্ত।

[৫৭] অন্যান্য দো‘আর সাথে এ দু‘আ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর দুরূদ পড়ার কথা এসেছে। হাকেম: ১/৩২৫; আবু দাউদ, হদীস নং ৪৬৫।

[৫৮] তিরমিযী, হদীস নং ৯৫৯; আল-হাকিম: ১/৪৮৯।

[৫৯] মুসান্নাফ আবদুররায্যাক: ৫/১৬ হাদীস নং ৮৮৩০; মু‘জামুল কাবীর ১২/৪২৫; সহীহুল জামে‘, হদীস নং ১৩৬০।

[৬০] সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১৯। দাসমুক্ত করার সাওয়াব অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কেউ কোন মুমিন দাস-দাসীকে মুক্ত করবে, সেটো তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। [আবূ দাউদ, হদীস নং ৩৪৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, কেউ কোনো দাসমুক্ত করলে আল্লাহ দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। [তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬১]

[৬১] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২।

[৬২] ফাতহুল বারী: ৩/৪৬৩।

[৬৩] সহীহ বুখারী, ৩/৪৭৬।

[৬৪] আত-তালখসিুল হাবীর: ২/২৪৭।

[৬৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৬; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৬৮।

[৬৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬০৮।

[৬৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৯৩।

[৬৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩২।

[৬৯] তাবরানী, হাদীস নং ৫৮৪৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ: ৩/২৪০। এ বর্ণনাটির সনদ সম্পর্কে দু’ধরণের মত পাওয়া যায়, তবে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন তা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, শারহু হাদীসে জাবের।

[৭০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৫১।

[৭১] রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর) বলা ভালো। কারণ, ইবন উমর রা থেকে এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. বাইহাকী: ৫/৭৯; ইবন হাজর, তালখীসুল হাবীর: ২/২৪৭।

[৭২] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯২।

[৭৩] তিরমিযী, হাদীস নং ৯০২, জামেউল উসূল, হাদীস নং ১৫০৫।

[৭৪] মুসনাদে আহমদ: ৩/৩৯৪; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮ ও ১২৬২।

[৭৫] মুসনাদে আহমদ: ৩/৩৯৪; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮ ও ১২৬২।

[৭৬] সহীহ মুসলিম ১/৮৮৮।

[৭৭] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[৭৮] নাসাঈ ২/৬২৪; মুসনাদে আহমদ: ৩/৩৮৮।

[৭৯] নাসাঈ ২/২২৪; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২/২২২।

[৮০] আবূ দাউদ: ১/৩৫১।

[৮১] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২১৩৭।

[৮২] উদাহরণস্বরূপ দ্র. বাইহাকী: ৫/৪৯-৫০।

[৮৩] ইবন আবী শাইবা: ৪/৬৮; বাইহাকী: ৫/৯৫; তাবারানী, আদ-

দ৻োা'আ: ৮৭০; আলবানী, হজ্জাতুন নবী পৃ. ১২০।

[৮৪] নাসাঈ, হাদীস নং ৪৭৯২।

[৮৫] ফাতাওয়া ইবন বায: ৫/২৬৪।

[৮৬] সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২১৮।

[৮৭] মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা: ৩/১৪৭।

[৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৮৯; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১২০৭।

[৮৯] আবূ দাউদ, হদীস নং ১৮১১; ইবন মাজাহ, হদীস নং ২৯০৩।

[৯০] মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৩৫।

[৯১] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৪৮।

[৯২] মুসনাদ আহমদ: ২/২২৪।

[৯৩] সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হদীস নং ১১৫১।

[৯৪] আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, হদীস নং ৮৮৩০।

[৯৫] তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৩৭; মুআত্তা মালেক: ১/৪২২।

[৯৬] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১৬৩।

[৯৭] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১২৩; মুসনাদে আহমদ: ২/৩০৪।

[৯৮] মুসনাদে আহমদ: ২/৩০৪।

[৯৯] বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফজরের পূর্বেই তাদেরকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া হয়। নিশ্চয় এটা সুন্নতের পরিপন্থী। তবে পরিবেশে পরিস্থিতির কারণে এ সুন্নত ছুটে গেলে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

[১০০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৭৫; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৮৫।

[১০১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬০; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[১০২] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[১০৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৬২।

[১০৪] জা‘ফর আহমদ উসমানী, এ‘লাউস্‌সুনান, ৭/৩০৭৩, দারুল ফকির, বৈরূত, ২০০১।

[১০৫] জা‘ফর আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত।

[১০৬] মুসনাদ আহমদ: ২১৮৭০; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১১।

[১০৭] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৭৫।

[১০৮] মুআত্তা মালেক, হদীস নং ৩০১; মুসনাদে আহমদ, হদীস নং ১৬৭৯৭।

[১০৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭১।

[১১০] প্রাগুক্ত।

[১১১] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[১১২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৮৩।

[১১৩] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[১১৪] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৮।

[১১৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৮, সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৯৪।

[১১৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৬৪।

[১১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৭৯, সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৯১।

[১১৮] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২২।

[১১৯] মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। এ স্থানে আল্লাহ

তা‘আলা আবরাহা ও তার হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন।

[১২০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৪৪, সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৮১।

[১২১] আবূ দাউদ: ২/১৪৭।

[১২২] আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮৯০।

[১২৩] নিজ হাতে ৬৩ টি অন্যগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে। সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১৭।

[১২৪] সহীহ মুসলিম ৩/১৫৫৭; বাইহাকী ৯/২৮৭।

[১২৫] সহীহ বুখারী ৩/৫৫৩; সহীহ মুসলিম ২/৯৫৬।

[১২৬] আবূ দাউদ, হদীস নং ২৩২৪।

[১২৭] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ৩০০৯।

[১২৮] এটাকে দমে-খাতা ভুলের মাশুল বলা হয়।

[১২৯] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ৩৯৫৯।

[১৩০] সাইয়্যেদ আস-সাবেক: ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৭৪৩।

[১৩১] আবূ দাউদ, হদীস নং ১৯৮৫।

[১৩২] তিরমিযী, হাদীস নং ৯১৫।

[১৩৩] সাইয়্যেদ আস-সাবেক: প্রাগুক্ত ১/৭৪৩।

[১৩৪] বায়হাকী, হদীস নং ৯১৮৬।

[১৩৫] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২২৯৮।

[১৩৬] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২০৪২।

[১৩৭] সহীহ বুখারী ৩/৪৯১; সহীহ মুসলিম ২/৮৯২।

[১৩৮] আবূ হানীফা রহ.-এর মতে এ সাঈ করাটা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও ইমাম এটিকে ফরয বলেছেন। আর এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।

[১৩৯] ইবন তাইমিয়া রহ বলেন, এর জন্য সে মহিলার ওপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

[১৪০] ইবন মাজাহ, হদীস নং ৩০৫০।

[১৪১] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২৩০৫।

[১৪২] বাদায়উস্‌সানায়ে': ২/১৫৮।

[১৪৩] আবূ দাউদ: ৬/২১৯।

[১৪৪] আবূ দাউদ: ৬/২১৯।

[১৪৫] সহীহ ইবন মাজাহ: ২/১৭৯।

[১৪৬] সহীহ আবূ দাউদ: ৬/২২০।

[১৪৭] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১১৪১।

[১৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭।

[১৪৯] আবূ দাউদ, হদীস নং ১৬৮৩।

[১৫০] ইবন আবী শায়বা: ১৪৩৬৮।

[১৫১] ই'লাউস্‌সুনান: ৭/৩১৯৫।

[১৫২] ইবন আবী শায়বা, হদীস নং ১৪৩৬৭।

[১৫৩] হানাফী মাযহাবের একখানি বিখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থের নাম।

[১৫৪] এ‘লাউস্সুনান: ৭/৩১৯৫। (تَرْكُ تَحْرِيْمًا مَكْرُوْهٌ بِهَا الْمُقَامِ)

[১৫৫] প্রাগুক্ত

[১৫৬] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২৯৯।

[১৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৪৬।

[১৫৮] মুআত্তা মালিক: ১/৪০৮।

[১৫৯] বাইহাকী: ১০/১১৬; ইবন আবদুল বার, জামেউ বায়ানিল ইলম: ২/৯৭।

[১৬০] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করতেন, তখন তিনি সোজা চলে যেতেন, সেখানে তিনি দাঁড়াতেন না (ইবন মাজাহ, হদীস নং ৩০৩৩)।

[১৬১] আবু দাউদ, হদীস নং ১৯৫২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হদীস নং ২৯৭৩।

[১৬২] মুআত্তা মালিক: ১/৪০৭।

[১৬৩] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩২৭।

[১৬৪] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩২৮।

[১৬৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪০১; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১২১১।

[১৬৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৯৭।

[১৬৭] ইবন তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ৫/১৪৯।

[১৬৮] আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়াইশ-শাইতান: ১/৩০৭

[১৬৯] শা‘আয়িরে বলতে আল্লাহর নিদর্শন এবং তাঁর ইবাদতের স্থানসমূহ বুঝায় (কুরতুবী: ২/৩৭)।

[১৭০] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ: ১/৪০৮।

[১৭১] ফায়যুল বারী: ৪/৪৩।

[১৭২] আবূ দাউদ, হদীস নং ১৭৪৬।

[১৭৩] আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়াইশ শয়তান: ১/৩০৭।

[১৭৪] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২৪২৩।

[১৭৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৩; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৮৩।

[১৭৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৭; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৪৭। হাদীসের অর্থ হলো: ঈমান মদীনা অভিমুখী হবে এবং মদীনাতেই তা অবশিষ্ট থাকবে। আর মুসলমানগণ মদীনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং মদীনামুখী হবে। তাদেরকে তাদের ঈমান ও এ বরকতময়

যমীনের প্রতি ভালোবাসা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

[১৭৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৫; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৬০।

[১৭৮] সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৭৩।

[১৭৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১২৯; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৬০। সা‘ ও মুদ দু’টি পরিমাপের পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে দু‘আ করেছেন যেন তাতে বরকত হয় এবং তা দিয়ে যেসব বস্তু ওযন করা হয়- সেসব বস্তুতেও বরকত হয়।

[১৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮০; সহীহ মুসলিম, হদীস নং ১৩৭৯।

[১৮১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৪।

[১৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭০।

[১৮৩] শাইখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা: পৃ. ৭৫।

[১৮৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৪। (পাঠ মুসলিমের)

[১৮৫] মাজমা'উয যাওয়াইদ: ৪/১১।

[১৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

[১৮৭] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭।

[১৮৮] মাজমাউয যাওয়াইদ: ১/১২৩।

[১৮৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২০; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ২৪৬৩।

[১৯০] আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬।

[১৯১] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১।

[১৯২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৪; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১৬৫৪।

[১৯৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২০; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ২৪৬৩।

[১৯৪] সহীহ মুসলমি, হদীস নং ১০১৩।

[১৯৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৫; সহীহ মুসলমি, হদীস নং ৯৮১।

[১৯৬] ইবন তাইমিয়া, মাজমূ‘ ফাতাওয়া: ২৪/৩৫৮।

[১৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; ইবন হিব্বান: ৩১৭২।

[১৯৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৪; নাসাঈ, হাদীস নং ২০৩৯।

[১৯৯] মদীনার অদূরে একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে এটি মদীনার অংশ।

[২০০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৯।

[২০১] হাকেম, মুস্তাদরাক: ৩/১২।

[২০২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৯।

[২০৩] ড ইলয়িয়াস আবদুল গনী, আল-মাসাজদি আল-আছারয়ি্যা: পৃ. ১৮৬।